শিক্ষায় বন প্রতিবেশ আধুনিক বাংলাদেশ

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

শিক্ষায় বন প্রতিবেশ, আধুনিক বাংলাদেশ- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর শুরু হতে যাচ্ছে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯। বন ও প্রতিবেশ বিষয়ক শিক্ষা চারপাশের বিশ্বের সাথে আমাদের সংযুক্ত করে প্রাকৃতিক এবং নির্মিত উভয় পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ায়। এছাড়া বন, প্রতিবেশকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় যাতে আমরা এর উন্নতি ও সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারি। শিক্ষা প্রদানকালে আমরা শ্রেণীকক্ষে প্রকৃতিকে নিয়ে আসি, আবার শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিবিড় প্রকৃতির মাঝে নিয়ে যেতে পারি।

বিভিন্নভাবে আমাদের দেশের কোমলমতি শিশু কিশোর, তরুণ তরুণী যুবক বৃদ্ধ সকলেই এ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে দলগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের বা যে কোন সংগঠনের মাধ্যমে তরুন তরুণীদের প্রাকৃতিক পরিবেশে নিয়ে বন প্রতিবেশ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর জন্য দূরের বনাঞ্চলে না গিয়েও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশের ঝোপজঙ্গল, জলাভূমি ইত্যাদি থেকেও নানা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি পরিবেশ সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে এবং এগুলো সুরক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এবছরের বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্যের সার্থকতার বিকাশ ঘটাতে বাংলাদেশের বন সম্পর্কিত কিছু তথ্য আজকের আলোচনায় সন্নিবেশ করা হলো।

আমাদের দেশের বন ও বনাঞ্চলের অনেক বৈচিত্রতা রয়েছে। কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিতভাবে বনের বৃক্ষ নিধন করে বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরসহ নতুন নতুন নগরায়ন, শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে বাংলাদেশে বনের পরিমান আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে জানা অজানা প্রাণী ও উদ্ভিদসহ প্রানবৈচিত্র্যের অনেক উপাদান। তথাপি সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততায় বন বিভাগ তার ঐকান্তিক প্রচষ্টোয় বাংলাদেশের বন সংরক্ষণের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

ভৌগলিক অবস্থান এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় বৃক্ষের পরিমাণ কম থাকায় ভূমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা হ্রাস, পাহাড়ী ভূমি ধস, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে নির্ধারিত বনায়নসহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপক বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি যে, একটি দেশের ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায়কল্পে দেশের আয়তনের ২৫ ভাগ এলাকায় বন থাকা উচিত। পৃথিবীর স্থলভাগের তিন ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ৪ বিলিয়ন হেক্টর এলাকায় বন আছে। অন্যদিকে বন উজাড়ও আশংকাভাবে বেড়েছে, প্রতিদিন বন উজাড় হচ্ছে ৩৫৬০০ হেক্টর, যা বছরে দাঁড়ায় ১৩ মিলিয়ন হেক্টর। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ ০.৬২ হেক্টর যা ১৯৬০ সালের তুলনায় মাত্র অর্ধেক বনভূমি। বাংলাদেশের মাথাপিছু এ বনভূমির পরিমাণ মাত্র ০.০১৫ হেক্টরের চেয়েও কম। বন বিভিন্ন ভাবে আমাদের জীবনে অসীম অবদান রাখে। পৃথিবী পৃষ্ঠে বনরাজি আছে বলেই পৃথিবী নামক গ্রহটা জীবজগৎ ধারন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া সুস্বাদু খাবার পানি ধারণ, শোধন ও জমাকরণ, বায়ুমন্ডলের পরিবেশ উন্নয়ন কাজ, পাল্প সহ বিভিন্ন কারখানার কাঁচা মাল সরবরাহ, ঔষধি উদ্ভিদসহ ঔষধ শিল্পে কাঁচা মাল সরবরাহ, ফার্ণিচার, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে কাঠ সরবরাহ, কার্বন ডাই অক্সাইড শোধণ অক্সিজেন

সরবরাহসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও বনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবী ব্যাপী কাঠ ও কাঠ জাতীয় দ্রব্য নিয়ে বছরে প্রায় ২১০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়। উষ্ণমন্ডলীয় বনাঞ্চলে পৃথিবীর ৫০% এর বেশি জীব বৈচিত্র বিরাজমান। এছাড়া ৬০ মিলিয়ন আদিবাসী সম্পূণরূপে জীবন জীবিকা নির্বাহে বনের উপর নির্ভরশীল। আরো ২৫০ মিলিয়ন উপজাতি বন এলাকায় জুম চাষের মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বন ও বনজ সম্পদ পৃথিবীর প্রায় মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। অনেকের জীবন জীবিকার উৎস, সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য নির্মল পরিবেশ, বন্য পশু পাখির নিরাপদ আবাসস্থল তৈরীসহ সাম্প্রতিক সময়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য বন ও বনভূমির অবদান অপরিসীম।

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার উত্তর পূর্বাংশের ২০০৩৪^3 ও ২৬০৩৮^3 উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮০০১^3 ও ৯২০৪১^3 পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল একটি দেশ। দেশের আয়তন ১৪.৭৫৭ মিলিয়ন হেক্টর। দেশটির আবহাওয়া উষ্ণমন্ডলীয় এবং বর্ষা ও শুকনো মৌসুম পৃথকভাবে বিরাজ করে। আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ছোট হলেও ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ এক সময় জীব বৈচিত্র্যে প্রাচুর্যময় ছিল। সভ্যতার আগ্রাসনে এর কিছু অংশ হারিয়ে গেলেও উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র এখনো বিদ্যমান। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ৫,৭০০ সপুস্পক উদ্ভিদ, ২৬৬ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ২২ প্রজাতির উভচর, ১০৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৮ প্রজাতির স্থানীয় পাখি ও ১১০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিদ্যমান ছিল। দ্রুত জন সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয়কারী উন্নয়ন কার্যক্রম, বন উজাড়, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক আহরণ, বন্যপ্রাণীর আবাস স্থল ধ্বংস, আগ্রাসী প্রজাতির আগমন প্রভৃতি আমাদের দেশের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের বনঃ বাংলাদেশের সরকারী বনভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ১৫.৭৮%। বনভূমিতে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ এর চেয়ে কম। বিস্তৃতি, প্রতিবেশ ও অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়-পাহাড়ি বন, শালবন ও উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)। পাহাড়ি বন দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে, শাল বন দেশের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে এবং সুন্দরবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। প্রাকৃতিক বন ছাড়াও সারাদেশে বসত বাড়ির আশে পাশে, নদীর পাড়ে, রাস্তার ধারে, খালের ধারেও বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকা বিদ্যমান। আমরা এই বৃক্ষাচ্ছাদিত বনকে গ্রামীণ বন বা বসত ভিটা সংলগ্ন বন বলে থাকি। দেশে প্রাক্কলিত গোল কাঠের চাহিদা বার্ষিক ১৫.৩ মিলিয়ন ঘনমিটার আর সরবরাহের পরিমাণ মাত্র ৮.৩ মিলিয়ন ঘনমিটার। এ থেকেই দেশে কাঠের ঘাটতির পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়। বিগত দশক গুলোর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গড়ে প্রতিবছর কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যের চাহিদা এক থেকে দুই শতাংশ হারে বাড়ছে।

দেশে মোট সরকারী বনভূমির পরিমাণ ২.৬১ মিলিয়ন হেক্টর। বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ ১.৮৮ মিলিয়ন হেক্টর এবং অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর। অশ্রেণীভূক্ত পাহাড়ী বন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ও সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ সাধারণত জুম চাষ করে থাকে।

পাহাড়ী বনঃ চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলায় পাহাড়ী বন অবস্থিত। উল্লেখিত জেলা সমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ী বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ী বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪%। হরেক রকম বৃক্ষরাজী সমৃদ্ধ এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ হলো গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম, বাটনা, পিতরাজ ইত্যাদি। এছাড়া এ বনে প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

পত্র ঝরা বন বা শালবনঃ এই ধরণের বনে শাল অন্যতম প্রধান গাছ এবং শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা জুড়ে শাল প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এ বৃক্ষের উচ্চতা ১০-২৫ মিটার পর্যন্ত হয় এবং শীত কালে গাছের পাতা ঝরে যায়। এ বনের আয়তন প্রায় ১লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ০.৮১% । এই ধরণের বনের বেশীর ভাগ এলাকা ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মাঝামাঝি হতে ঢাকা জেলার উত্তর অংশ পর্যন্ত এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলকে মধুপুর গড় ও ভাওয়ালের গড় বলা হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে এ বন বিদ্যমান। এছাড়া শেরপুর, জামালপুরেও শালবন পাওয়া যায়।

শালবনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে শাল, কুসুম, হলদু, চাপালিশ, গাব্বী, পলাশ, উদাল, সিধাজারুল, ঢেপাজাম, বহেরা, কুরচি, হরিতকি, পিতরাজ, শীলকড়ই, চাকুয়াকড়ই, শেওড়া, শিমুল, হারগাজা, আমলকি, ভেলা, পানিয়াটুরি, মেন্দা, আছার উলেখ যোগ্য। বর্তমানে এবনের অনেক এলাকা জুড়ে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম ইত্যাদি দ্রুত বর্ধন শীল প্রজাতির বাগান সৃজন করা হয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবনঃ এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে অবস্থিত গ্রীস্মমন্ডলীয় আর্দ্র এবং চির সবুজবন। এর বিস্তৃতি সাতক্ষীরা, খুলনা, ও বাগেরহাট জেলায়। এটি পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। সামুদ্রিক জোয়ারে এ এলাকার নিম্নাঞ্চল প্রতি দিন দুবার পানিতে প্লাবিত হয়ে থাকে। এ বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় শতকরা ৪.০৭ ভাগ এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪০% । এ বনের প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি হলো সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া, গরাণ ইত্যাদি। উলেখযোগ্য বন্যপ্রানী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, কুমির, শুকর, অজগর ইত্যাদি। এ বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য নদ নদী এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মঙ্গল ইত্যাদি। এ সকল নদ নদীর কারণে এ বন মৎস সম্পদেরও বিরাট আঁধার। এ নদীর উল্লেখযোগ্য মাছ হলো ইলিশ, ভেটকি, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, পারসে, বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি ইত্যাদি।

গ্রামীণ বনঃ সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ বনের চাহিদা আমাদের কাছে বেশ আশার সঞ্চার করেছে। গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া এবং বাড়ি-ঘরের পিছনে বাঁশঝাড় এবং আশে পাশে আম, কাঁঠাল, লিচু, দেবদারু, তাল, খেজুর, সুপারী ও নারিকেলের বাগান এবং তার যে ছায়াঘেরা পরিবেশ তা যে কোন মিশ্র শুস্ক এবং আদ্র পাতা ঝরা বনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এখনো দেশের দক্ষিনাঞ্চলের সকল জেলা, ঢাকা, ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রাম, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার বসত বাড়িতে বেশ গাছ-গাছড়া আছে।

সমুদ্র সৈকত বনঃ এ ধরণের বন কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সমুদ্র তীরবর্তী ভূমি ও সমুদ্রের মাঝে বালিময় উঁচু এলাকায় বিছিন্নভাবে দেখা যায়। এ ধরণের বন একাধারে বিস্তৃত নয়। গাছের গড় উচ্চতা ৫-৮ মিটার পর্যন্ত হয়। এ বনের প্রধান বৃক্ষ ঝাউ, করমজা, পুনিয়াল, পালিতামান্দার, পানিয়া মান্দার, পরশ, হিজল, নিশিন্দা ইত্যাদি। এ ছাড়া বিস্তীর্ণ খালি এলাকা লতা জাতীয় গাছ দ্বারা আবৃত থাকে। অন্যান্য গাছের মধ্যে ডুলকলমি, হারগোজা, কেয়াকাঁটা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জলা ভূমির বনঃ জলাভূমি বলতে দেশের বিল, হাওর, বাওর, বাগুর, মরা নদীর অংশও বড় বড় দীঘিকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় বনাঞ্চল বৃহত্তর সিলেট জেলার হাওর এলাকার নিম্নভূমিতে অবস্থিত, যেখানে ভূমি প্রায় বৎসরের ৬-৭ মাস ধরেই পানিতে নিমজ্জিত থাকে। যেমন হাইল হাওর, হাকলুকি হাওর ইত্যাদি। এছাড়া চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বনাঞ্চলের মাঝে নীচু জলাভূমিতেও এ ধরণের বন দেখা যায়, যেমন কাপ্তাই লেক, কাট্টলি লেক ও মাইনি লেক ইত্যাদি। এ সব জলাভূমিতে বৃক্ষের মধ্যে হিজল, বরুন, করমজা, হারগাজা, পিটালী, জারুল পানি বিয়াস ইত্যাদি এবং গুল্ম জাতীয় গাছ হিসেবে বেত, ল্যান্টানা, খাগড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তৃণ ভূমির সাথে সহযোগী গাছ হিসেবে শীল কড়াই, মটর কড়ই, শিমুল, বহাল ইত্যাদি জন্মে। নদীর ধারে করমজা, কদম, তমাল, বিয়াস ইত্যাদি গাছ দেখা যায়। এছাড়া সিলেট, কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের হাওর এলাকায় জলাভূমির বন বিদ্যমান। সিলেটের রাতারগুল জলাভূমির বন হিজল, করচের জন্য বিখ্যাত।

উপকূলীয় বনঃ সরকার ১৯৬৫-১৯৬৬ থেকে উপকূল এলাকা, বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চলে উপকূলীয় বন সৃজনের চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলার বন বিভাগের মাধ্যমে ব্যাপক হারে উপকূলীয় বন সৃজনের কাজ চলছে। এ ছাড়া কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সোনাদিয়া, সন্দীপ, হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ, মৌলভীরচর, রামগতি, চরজব্বার, চরলক্ষী, মনপুরা এবং চর কুকরী মুকরীতেও বনায়নের কাজ চলছে। অদ্যাবধি প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় বন বাগান সৃজন করা হয়েছে। দ্বীপাঞ্চল এবং উপকূলীয় বাঁধে মূলতঃ কেওড়া, গেওয়া, কাঁকড়া, বাইন, পশুর, গরান, বাবলা এবং খয়ের গাছ লাগানো হচ্ছে।
দেশে বর্তমানে বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ প্রায় ২২.৪%।

পাহাড়ী বন জীববৈচিত্রের আধারঃ চট্টগ্রাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেটের পাহাড়ী বনসমূহ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বনের চেয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাচুর্যতা ও সম্পদে ভরপুর। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন প্রায় ১৩,১৮৪ বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ। পার্বত্য চট্টগ্রামের (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা) বনাঞ্চলেই এক সময় ১,৫৬০ টিরও বেশি সপুস্পক উদ্ভিদ পাওয়া যেত, যার মধ্যে ৬০০টি বৃক্ষ প্রজাতি। বাংলাদেশের বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বনাঞ্চলও এই পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। যেমন- কাসালং সংরক্ষিত বনাঞ্চল, রাইংক্ষং, সীতা পাহাড়, বরকল, সাংগু ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এ সব বনাঞ্চলে এমন কিছু মূল্যবান বৃক্ষ প্রজাতি পাওয়া যেত, যা দেশের অন্য কোন বনাঞ্চলে ছিল না।

১৯৯০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বলে ১৯৬৫ সালের ৩ আগস্ট তৎকালীন জেলা প্রশাসনের একটি সার্কুলারের (স্মারকনং-২৩৮৪/৪০) ভিত্তিতে স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন মৌজায় গ্রামীণ সাধারণ বন সংরক্ষণ শুরু করে। মৌজাস্থিত লোকজন তাদের পারিবারিক ব্যবহারের জন্য বনের গাছ, বাঁশ বা যে কোন সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবেন। এ সব বন ১০০ একর বা তারও বেশী এলাকা নিয়ে গঠন করা যাবে। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও অনেকের মতে পার্বত্য অঞ্চলে ৭০০-৮০০ মৌজা বন বিদ্যমান। সাধারণতঃ হেডম্যান ও কারবারীরা এই মৌজা পাড়ার সকলের ব্যবহার ও সুপেয় পানির জন্য এ বন সংরক্ষণ করে থাকে। পাড়ার বাসিন্দাদের প্রয়োজন বা যৌথ কাজে ব্যবহারের জন্য এ সব বন হতে সম্পদ আহরণ করা হয়। আমাদের অবক্ষয় প্রাপ্ত পাহাড়ী বনের মাঝে এই মৌজা বন থাকলেও বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনো তেমন কোন ব্যবস্থাপনা নেই। সময়ের আবর্তে বিভিন্নভাবে আমাদের দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সকলের উদ্যোগ হওয়া উচিত এখানকার সব বৃক্ষ প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা - যাতে এসব প্রজাতি একেবারেই হারিয়ে না যায়।

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্যঃ সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বনায়ন ও বনাঞ্চল সংরক্ষণে বন বিভাগ বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বন আইন সংশোধন করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র জনগণের অংশ গ্রহণ কল্পে বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পতিত প্রান্তিক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমিতে বনজ সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সৃষ্টি ও পরিবেশের ভারসাম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৪ হাজার ৯৩৯ হেক্টর এবং ৭১ হাজার ৪৫৬ কিলোমিটার বাগান সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত বাগানে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০১ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছেন, যাদের মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৬৭ জন।সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানসমূহ হতে ৩৯ হাজার ১০৫ হেক্টর এবং ১৬ হাজার ২৭৬ কিলোমিটার বাগান কর্তন করা হয়েছে; যার বিক্রয়মূল্য ১০৭১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪৫ টাকা। এ যাবৎ উপকারভোগীর মাঝে ৩৫৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫২২ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এযাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমান ৩৮৯ কোটি ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৫৮ টাকা। বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিভিন্ন বিকল্প আয় কর্মসূচীর উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত পূর্বক বনকে জনগণের সম্পদ বলে প্রতীয়মান করানো হচ্ছে।

রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনাঃ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১২ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছি। সরকার ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের মাধ্যমে 'রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়। আর সম্প্রতি ২০১৭ সালের নভেম্বরে "রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা" প্রণয়ন করে সরকার সহ-ব্যবস্থাপনার আইনি ভিত্তি দেয়। দেশের ২২ টি রক্ষিত এলাকায় আজ ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাজ করছে। এখানে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে -বন এলাকার জনগণ। বন পাহারা দল নিয়মিত টহলে যোগ দিচ্ছে বনপ্রহরীদের সাথে। পাহারা দলের এই অবদান প্রশংসনীয়। আমি আশা করছি, দেশের ৪০ টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করে বন অধিদপ্তর দেশের বাকী প্রাকৃতিক বন টিকিয়ে রাখবে।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু গাছ লাগানো ও বৃদ্ধির জন্য অসম্ভব উপযোগী বলে বিবেচিত হলেও জনসংখ্যার আধিক্য, দারিদ্রতা, আপামর জনসাধারণের সচেতনতার অভাবে আমাদের বনজ সম্পদ তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। এ উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরানো প্রায় ৭ হাজার হেক্টর আয়তনের ম্যানগ্রোভ বন চকরিয়া সুন্দরবন আমাদের কাছে এখন বিলুপ্ত। আমাদের ঐতিহ্য মধুপুর গড় ও ভাওয়াল গড়ের শালবন জবর দখলকারীদের উৎপাতে হুমকির সম্মুখীন। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে- যেমন উজান হতে সুস্বাদু পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, বনের ভিতর দিয়ে জাহাজ চলাচলের কারণে জাহাজ হতে বিভিন্ন বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ ইত্যাদি। অন্যদিকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ পাহাড়ী বনাঞ্চলও মানব সভ্যতার আধিক্যে ধ্বংসের দিকেই এগুচ্ছে।

২০১৯ সনের আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে Forest and Education: Learn to love forests! এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "শিক্ষায় বন প্রতিবেশ, আধুনিক বাংলাদেশ"। সে লক্ষ্যে এ বছরের বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার জন্য এ প্রতিপাদ্যের আলোকে বন প্রতিবেশকে সর্বস্তরের কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে টেকসই বন ব্যবস্থার জন্য বড় মাপের ভূমিকা রাখতে পারে সেই প্রচেষ্টা থাকবে। আন্তর্জাতিক বন দিবসের এ বছরের মূল বার্তার মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে,বনকে জানা এবং একে সমৃদ্ধিশালী রাখা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; আধুনিক এবং সনাতন দুটো জ্ঞানকেই ব্যবহার করতে হবে; পৃথিবীকে অধিকতর ভালো পরিবেশ সম্মত বাস উপযোগী করতে বনবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা প্রসারে বিনিয়োগ করতে হবে; সর্বোপরি বনকে জানার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার সমান সুযোগ থাকতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ এবং তা সংরক্ষণ করার এবং সেই সাথে বৃক্ষ প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান আহরণের জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF HYDROMULCHING AS A RAPID SOIL EROSION CONTROL MEASURE-A STUDY IN LANGAT SUB BASIN, PENINSULAR MALAYSIA

Dr. Mohammad Zahirul Haque a,d,*, Mohammad Imam Hasan Rezab, Sahibin Abd Rahima, Md. Pauzi Abdullahc, Rahmah Elfithrib, Mazlin Bin Mokhtarb

[a]*School of Environmental and Natural Resources Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia*

[b]*Institute for Environment and Development (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia*

[c]*School of Chemical Sciences and Food Technology, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia*

[d]*Bangladesh Forest Department, Ban Bhaban, Agargaon, Dhaka 1207, Bangladesh*

Abstract: Like most of the tropical countries in the world, Malaysia is facing large-scale soil erosion problem. The study area - Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) catchment under Langat river basin in Peninsular Malaysia releases estimated 28.78 tons/ha/year of sediment The hill-slopes are of sedimentary rock, susceptible to erosion from surface runoff. The best way to reduce runoff and control erosion is to establish permanent vegetation as quickly as possible. The objective of the study is to estimate the performance of hydromulching as a rapid control measure for the soil erosion. The study shows that the performance of experimental vegetation- Resam, Vetiver and Elephant creeper has effectiveness to controlling erosion. Rainfall was measured using the digitized HBO data logger. During rainfall events, water samples were collected for TSS concentration and discharge rates were measured from the barren and three natural vegetation covered plots. Hydromulch machine and materials were prepared. Signal grass was seeded in the barren plot by hydromulching in dry time and its growth performance was monitored. TSS concentration and discharge rates were measured in the rainfall event in hydro-mulched plot. All plots were demarcated by natural fragmentation and hand prepared thin drains on top, right and left of the slopes wherever was necessary. Geographical positioning system (GPS) was used to record the coordinates of the plots. The plots were digitized using ArcGIS 9.3 which measured their area slope and elevation. Validation was done with reviewing related literature. The study reveals that the hydromulching is the most effective rapid soil erosion controlling measure on steep slope.

Keywords: *Sediment yield, steep slope, barren hill forest, soil erosion in tropical country, runoff water.*

বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ ও প্লাষ্টিক দূষণের প্রভাব

ড. তপন কুমার দে
উপ-প্রধান বন সংরক্ষক(অবঃ), বাংলাদেশ বন বিভাগ

ভূমিকা

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds) প্রতি বছর যে ভৌগোলিক পথে (Geographical Route) এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে পরিভ্রমন করে থাকে তাকে উড়ন্ত পথ (Flyways) বলে। দেশান্তরী (Migration) হওয়ার মূল কারণগুলোর মধ্যে ঋতু পরিবর্তন খাদ্যের স্বল্পতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বংশানুক্রমিক ধারা অন্যতম। শীত মৌসুমে হিমালয় পর্বতমালা এবং সাইবেরিয়া থেকে, কদাচ উত্তর মেরু থেকেও কিছু পাখি আমাদের দেশে প্রতি বছরই আসে এবং আবার ফিরে যায়। বার্ষিক এই আসা-যাওয়াই হচ্ছে পাখির পরিব্রজন, অভিপ্রায়ণ (Migration)। অভিপ্রায়াত পাখিকে আমরা বলি শীতের পাখি, অতিথি পাখি, পরিব্রাজক, যাযাবর বা পরিযায়ী পাখি।

আমাদের দেশে দু'দলের শীতের পাখি বা অতিথি পাখি আসে। এদের এক দল কেবল এদেশেই আসে এবং এখান থেকেই ফিরে যায়। অন্য দল বাংলাদেশ থেকে আরো দক্ষিণে যায়। তারা এই আসা যাওয়ার সময় বাংলাদেশে কিছু সময় ব্যয় করে। এদেশে যাবার জন্য শীতের পাখিদের দেহে কিছু বাহ্যিক এবং কিছু আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক কাজ করে। প্রথম উদ্দীপক হচ্ছে চামড়ার নীচে খুব পুরু হয়ে জমে উঠা চর্বি। দ্বিতীয় হচ্ছে, আবহাওয়াগত যেমন দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, দৈনিক গড় তাপমাত্রা এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।

সারা দুনিয়ার পাখির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৯৯০০ থেকে ১০০০০ বলে পাখি বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন। সালীম আলী এবং এস.ডি রিপলের মতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান উপমহাদেশে পাখির প্রজাতির সংখ্যা ১২০০। প্রফেসর ড. মনিরুল এইচ খান (২০১৮) সাম্প্রতিক প্রকাশিত Photogrphy Guide to Wildlife of Bangladesh বইটিতে ৫৬৬ প্রজাতির পাখির তালিকা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি ধারনা করছেন বাংলাদেশে ৬৯০ প্রজাতির পাখি আছে। অন্যদিকে Siddique et. al (২০০৮) সম্পাদিত Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh Vol. ২৬ গ্রন্থে ৬৫০ প্রজাতির পাখি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। যারা মোট ২৯৫ গণের ৬৪ টি পরিবারের ১৬ টি বর্গের অন্তর্ভূক্ত। বিগত কয়েক দশকে আমাদের দেশ থেকে উনিশ প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়েছে, ১০ প্রজাতি পাখি মহাবিপদাপন্ন (Critically Endangered), ১২ প্রজাতি বিপন্ন (Endangered), ১৭ প্রজাতি সংকটাপন্ন (Vulnarable), ২৯ প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন (Threatened)। প্রফেসর ড. মনিরুল এইচ খান এর মতে ৬৯০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৩৩৭টি আবাসিক, ২০৮টি শীতকালীন পরিযায়ী, ১২টি গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী, ১৩৩টি অন্তর্বর্তীকালীন পরিযায়ী পাখি।

সম্প্রতি IUCN বাংলাদেশ (২০১৫) রেডবুকে ৫৬৬টি প্রজাতির বিস্তৃতি ও বর্তমান জীবনদশা (Present Status) সংক্ষেপে তুলে ধরেছে। ২ টি তালিকা তুলনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তা হলো এদের অবস্থার বা জীবনদশার (Status) বিস্তর পরিবর্তন। বিগত ২ দশকে কিছু কিছু প্রজাতি ব্যাপকহারে কমে যাওয়ায় এদের অবস্থা (Status) বা জীবনদশা আশংকাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে তাদের বিস্তার বা বাসস্থান ও অবস্থার উপর তেমন কোনো তথ্যই নেই। এদেরকে তথ্য অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্থানীয় পাখি প্রজাতির মধ্যে এ সংখ্যা ১৫৮টি এবং পরিযায়ী পাখিতে ৪টি। হুমকিগ্রস্ত বর্গগুলোর মধ্যে Ciconiiformes এর জীবনদশা সবচেয়ে বেশি শংকাগ্রস্ত। এরপর রয়েছে Passeriformes ও Galliformes বর্গ। হুমকির (Threatened) সম্মুখীন প্রজাতির মধ্যে ১৯টি মহাবিপন্ন (Critically

Endangered), ২০টি বিপন্ন (Endangered), ৮টি সংকটাপন্ন (Vulnerable) এবং ৬টি কম সংকটাপন্ন (Lower Risk)। খান (১৯৮২) ও আইইউসিএন বাংলাদেশ (২০০০) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে পাখির অতীত ও বর্তমান অবস্থা এবং বিস্তৃতির তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অত্যাধিক কীটনাশক ও প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার, পাখির বসতি ধ্বংস, পরিবর্তন, খন্ডায়ন, অতিমাত্রায় পাখি শিকার, বনাঞ্চল উজাড় এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব ইত্যাদি পাখির জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

জাতিসংঘের UNEP (United Nation Environment Programme), CMS (Convention on Migratory Species of Wild Fauna)ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর ০৯-১০ মে তারিখে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস (World Migratory Bird Day), পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ২০১০ সাল হতে জাতীয়ভাবে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে ২০১৯ সালে প্রতিপাদ্য বিষয় "Protect Bird: Be The Solution to Plastic Pollution". যার বাংলায় ভাবার্থ "পাখি সংরক্ষণে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি"নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শীতের পাখি আসে ভরা শীতে মানে পৌষ ও মাঘে। অধিকাংশ শীতের পাখি আসে সাইবেরিয়া থেকে। এ দুটি ধারণা বহুলাংশে মিথ্যা। অনেক সময় জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এবং আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রথম শীতের পাখি বাংলাদেশে আসে। সাধারণ চা পাখি (Common Sandpiper) দেশের প্রায় সব এলাকায় অল্প বিস্তর পৌঁছায়। এ সময় হাজারো আবাবিল পৌঁছায় টেকনাফ থেকে কুমিল্লা এবং জামালপুর ময়মনসিংহের গারো পাহাড় এলাকায়। ঢাকা শহরে আগস্টের মধ্যে চলে আসে বাদামী কসাই (Brown Shrike), লালবুক চটক (Taiga Flycatcher) এবং শীতের ভূবন চিল (Pariah Kite/Black Kite)। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আসে খঞ্জন, চাপাখি, কাদাখোঁচা, চ্যাগা, গুলিন্দা, বাটান, জিরিয়া, জল কবুতর, ওয়ার্বলার, চটক প্রভৃতি দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে ফেলে। হাওড়ে চরায় এবং খাড়ি অঞ্চলে হাঁস আসতে শুরু করে অক্টোবরে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী এই তিন মাস দেশের সর্বত্র শীতের পাখি সর্বাধিক দেখা যায়।

পরিযায়ী পাখির চলাপথ

পরিযায়ী পাখি নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। কোন প্রজাতির পাখি কখন আসে যায় সেটা জানার জন্য জাল পেতে পাখি ধরে তাদের পায়ে, এক ধরণের হালকা এলুমিনিয়ামের তৈরী নম্বরযুক্ত আংটি পড়িয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির জন্য বিভিন্ন সাইজের আংটি থাকে। আংটির উপর নম্বরের সাথে GI লেখা থাকে যে কোন লোক যদি আংটিযুক্ত পাখি পায় তবে যেন সে ঐ আংটির খবর যারা আংটি পড়িয়েছেন তাদেরকে জানায়। যেমন বোম্বে নেচারাল হিষ্ট্রী সোসাইটির আংটিতে লিখা থাকে Inform Bombay Nat. Hist. Soc.যে বছর আংটি পরানো হলো পরের বছর সেখানে জাল পেতে পাখি ধরে তাদের পায়ের আংটির সাথে মিলালে দেখা যাবে আগের বছরের পাখিরা ফিরে এসেছে কিনা। এছাড়া বর্তমানে সেটেলাইট কলার (Satellite Colar), রেডিও কলার, ডিজিটাল ট্যাগ ও মাইক্রোচিপস ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্ত পাখিবিদগণ সংগ্রহ করছেন।

পৃথিবীতে ৯টি Flyway Site Network আছে যা নিম্নরূপ ঃ-

- East Asian- Australasian Flyway
- East Atlantic Flyway
- Black Sea/Mediterranean Flyway
- West Asian-East African Flyway

- Central Asian Flyway
- West Pacific Flyway
- Pacific Americas Flyway
- Mississippi Americas Flyway
- Atlantic Americas Flyway

বাংলাদেশ East Asian- Australasian Flyway (EAAF) ও Central Asian Flyway এর অন্তর্ভূক্ত। এই Flyway এর আওতায় বাংলাদেশ, ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, রাশিয়া, উত্তর আমেরিকা (আলাস্কা), মঙ্গোলিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, লাওপি.ডি.আর, মায়ানমার, ব্রুনই, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড ও পূর্বতিমুরসহ ২২টি দেশে পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে EAAF এই উড়ন্ত পথে পৃথিবীর ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি (৫ কোটি) চলাচল করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২৮টি পরিযায়ী পাখি অন্তর্জাতিকভাবে মহাবিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লখযোগ্য রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামুক খোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

পাখির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ

পাখির আবাসস্থল ধ্বংস; বন ও গ্রামীন গাছগাছালি হ্রাস; প্লাস্টিক দূষণ; জলাভূমির জবরদখল; পরিযায়ী পাখির নীলাভূমি হাওড়-বাঁওড়ে ব্যাপকহারে মাছ শিকার; নদী ও সমূদ্রের নতুন চরে জেলে এবং শিকারীদের উৎপাত; যথেচ্ছ ভাবে পাখি পাচাঁর ও নিধনের ফলে ইতোমধ্যে আমাদের দেশে আশংকা জনকভাবে পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া জলাভূমিতে কৃষি সম্প্রসারণ; অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ; চোরা শিকারী কর্তৃক ব্যাপক হারে অতিথি পাখি শিকার ও বাজারজাতকরণ; কলকারখানার প্লাস্টিক ও রাসায়নিক বর্জ্য ও কীটনাশকের প্রভাবে পানি দূষণ; বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন; সমূদ্রের পানি লবনাক্ততার বৃদ্ধি এবং নতুন জেগে ওঠা চরে মানুষের বসতি ও কৃষি জমির সম্প্রসারণের কারণে পাখির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

পাখি সংরক্ষণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পাখিদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বলে শেষ করা দুরূহ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ডিম, মাংস ইত্যাদি আহার করে থাকি তা আসে প্রধানত: খামারজাত পাখি থেকেই। তবে অনেক দেশে প্রকৃতি থেকে পাখি ধরে মাংস হিসাবে বাজারজাত করছে। সুতরাং খাদ্যের উৎস হিসেবে পাখি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাখি ইঁদুর এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গ খেয়ে আমাদের শস্যের উপকার করছে এবং একই সাথে নোংরা আবর্জনা খেয়ে আমাদের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। শকুন, কাক, চিল না থাকলে গ্রামাঞ্চলের একটি প্রাণীর মৃতদেহ থেকে পুরো এলাকার আবহাওয়া দূষিত হতে পারতো।কোন কোন বীজ আছে সেগুলো কাক বা অন্য পাখির পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ঘুরে না এলে তা থেকে উদ্ভিদ হবে না। আর এসব পাখিদের সাহায্যে দুর-দুরান্তের গাছের বীজ চলে আসে নতুন জায়গাতে। ফুলের পরাগায়নেও পাখিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত: ছোট ছোট পাখিরা

যখন এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যায় তখন পালকে ফুলের পরাগরেণু মেখে নেয়। এভাবে পরাগায়ণ হয়ে ফুল থেকে ফল হয়। চড়ুই বা অন্য পাখিরা ক্ষেতের ধান খেয়ে আদৌ কোন ক্ষতি করে কিনা, বা কতটুকু ক্ষতি করে সেটা নির্ণয় সাপেক্ষ। বাংলাদেশে চড়ুইসহ অন্যান্য পাখি কেবল ধানই খায় না, ধানের ক্ষতিকারক বিভিন্ন কীটপতঙ্গও খেয়ে থাকে। সুতরাং এদেরকে শস্যের ক্ষতিকারক বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এভাবে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। পাখি আমাদের ইকো-সিস্টেমের (Eco-system) অংশ এবং এদের সংখ্যা হ্রাস পেলে তার প্রভাব আমাদের উপর পরবে।

আমাদের দেশের হাওর-বাওর ও চরাঞ্চলে শীতের অতিথি পাখি দেখার জন্য হাজার-হাজার দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটে থাকে। পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করার জন্য পরিযায়ী পাখি ও আবসস্থল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে পাখি মরার সঠিক তথ্য ও উপাত্ত আমাদের হাতে নেই। তবে প্রতিদিন সারাদেশে বিভিন্ন জাতের পাখি শিকার, পাচার ও নিধনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই আমাদের দেশ থেকে পাখি বিলুপ্ত ও বিপন্ন হয়ে যাবে।

জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব

বাংলাদেশে প্রায় ৬.৮ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি রয়েছে। এর মধ্যে নদ-নদী,খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, লেক-পুকুর, ঝর্ণা, সমুদ্র, উপকূল ইত্যাদি। এ সকল এলাকায় বছরের বিভিন্ন সময় পরিযায়ী পাখি বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে শীতকালে আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা সর্বাধিক। বিশেষ বৃহত্তর সিলেট এলাকার টাঙ্গুয়ার হাওড়, হাকালুকি হাওড়-বাওড় ও বাইক্কা বিলসহ বিভিন্ন জলাভূমি এলাকায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। এ সমস্ত এলাকা একদিকে যেমন মিঠা পানির মাছের জন্য সমৃদ্ধ অন্যদিকে পাখির আবাসস্থলের জন্য খুবই উপযোগী। গত বছর আগাম পাহাড়ী ঢলের কারণে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রায় সকল হাওড়ের উঠতি ফসল, মাছ, হাঁস ও গবাদিপশুসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে করে হাওড়ে জলজ জীব বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে এবং এর ফলে এ বছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

প্লাষ্টিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব

প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়ন টনের অধিক প্লাস্টিক সামগ্রী মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয়। প্লাষ্টিক বর্জ্য পচনশীল নয় এবং প্রায় ২০ থেকে ৫০০ বছর ব্যবধানে পঁচে মাটি বা পানিতে দ্রবীভূত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার অনেক বেশী। বিশেষ করে প্লাস্টিক ব্যাগ, পানি বা তৈল জাতীয় পদার্থের বোতল, গ্লাস, থালা ও অন্যান্য সামগ্রী ওজনে কম এবং পরিবহনের সুবিধার কারণে দিন দিন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবহারের পরে এসকল প্লাস্টিক দ্রব্যাদি যত্রতত্র আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়ার কারণে জলজ ও স্থলজ পরিবেশ ব্যাপক হারে দূষিত হচ্ছে। অধিকাংশ পরিযায়ী পাখির চারণভূমি সমুদ্র সৈকত, নদী, খাল, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি তীরভূমি। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিবছর ৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য নদী নালা হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। প্লাস্টিক সহজে পানিতে দ্রবীভূত হয় না এবং পানি, সূর্য ও বায়ূ প্রবাহের কারণে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হয়ে পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। বিশেষ করে পানির শ্যাওলা জাতীয় গাছ প্লাস্টিক বর্জ্যের উপর আশ্রয় করে ভাসমান থাকে এবং পাখি ও মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী খাদ্যের সাথে প্লাস্টিক পাকস্থলিতে ঢুকে যায় এবং পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতিসাধন ও জটিল রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া নায়লন ও প্লাস্টিকের জালে আটকা পড়ে অনেক পাখি মারা যায়। মৃত পাখির দেহবশেষ পরীক্ষা করে পেটের ভিতর অনেক ছোট ছোট প্লাস্টিক টুকরা ও কণা (Microplastic) পাওয়া যাচ্ছে। সমুদ্র সৈকতে আসা পাখি খাদ্য গ্রহণের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে প্লাস্টিকের ছোট ছোট অংশ খাদ্যণালীতে চলে যায়। শুধু তাই নয় পাখির ছোট বাচ্চাদের আধার গিলার সময় প্লাস্টিক কণা পেটে চলে যায় এবং অকালে বাচ্চা মারা যায়।

ক) প্লাস্টিক দূষণের উৎস

- জলযান, লঞ্চ, ট্রলার, নৌকা ও জাহাজ হতে অব্যবহৃত প্লাস্টিক সামগ্রী (পলিব্যাগ, বোতল, ক্যান ইত্যাদি)
- খাল, বিল, নদী-নালা ও সাগরের পানিতে ফেলা হয়।
- মাছ ধরার সময় জলযান হতে পুরনো অব্যবহৃত নাইলন/প্লাস্টিক জাল পানিতে ফেলা হয়।
- বিভিন্ন কল-কারখানা হতে প্লাস্টিকের কঠিন বর্জ্য যেমন- ক্যান, বোতল, প্লাস্টিক প্যাকেটের অব্যবহৃত অংশ ইত্যাদি পানিতে ফেলা হয়।
- থার্মো-প্লাস্টিক কারখানা হতে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যবহারের পর পানিতে ফেলা হয়।

খ) পাখিরা কেন প্লাস্টিক খায়

- প্লাস্টিকের ছোট ছোট টুকরা ও কণা পানিতে শ্যাওলা সহ ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং পাখি আধার হিসেবে গিলে ফেলে।
- শ্যাওলাযুক্ত ভাসমান প্লাস্টিক কণা, গন্ধ পাখির খাবারের গন্ধের মত।
- প্লাস্টিক কণা ভাসমান বিধায় খাদ্যের মত মনে হয়।

গ) কিভাবে পাখি প্লাস্টিক দূষণের শিকার হয়

- ধারালো প্লাস্টিক কণা পানিতে ভাসমান অবস্থায় শ্যাওলার আবরণে ঢাকা থাকে এবং ক্ষুধার্ত পাখি খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে প্লাস্টিক কণা পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পরিপাকনালীর ক্ষতিসাধন করে। ধীরে ধীরে পাখিটি দুর্বল হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।
- অনেক সময় পাখিরা প্লাস্টিক কোটেড ক্ষতিকর রাসায়নকি পদার্থ ভুলবশত: খেয়ে ফেলে এবং এতে করে পাখির পরিপাকতন্ত্রে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়।
- পানিতে মৎস্য শিকারের জন্য পাতা নায়লন/প্লাস্টিক জালে বা পতিত ছেড়া জালে পাখি আটকা পড়ে থাকে এবং নড়াচড়া করতে পারে না। অতি সহজে শিকার প্রাণী আটকা পড়া পাখি খেয়ে ফেলে।
- মৎস্য আহরণে সমুদ্রগামী ট্রলারের অব্যবহৃত ছেড়া জাল অনেক সময় পানিতে ফেলে দেয় এবং এ সকল জালে আটকা পড়ে পাখি মারা যায়।
- পাখিরা অনেক সময় গভীর পানিতে ডুব দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। এসময় অনেক পাখি প্লাস্টিক
- ব্যাগ ও পরিত্যাক্ত জালে আটকা পড়ে পানির উপর উঠতে পারে না এবং মারা যায়।
  ধারালো প্লাস্টিক কণা, ব্যাগ ও জালে পাখি আটকা পড়লে দেহে ঘা ও ক্ষত হয় এবং আস্তে আস্তে পাখির সমস্ত দেহে সংক্রামিত হয়ে পাখি মারা যায়।
- সাম্প্রতিক একটি গবেষণার সমীক্ষায় দেখা যায় ৯০% সমুদ্র সৈকত পাখির (Sea Shore Bird) পরিপাকতন্ত্রের প্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। প্রতিবছর প্রায় ১ মিলিয়ন সামুদ্রিক পাখি (Sea Bird) প্লাস্টিক দূষণের শিকার হচ্ছে এবং এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালে ৯৯% পাখির পেটে প্লাস্টিক কণা পাওয়া যাবে।
- অষ্ট্রেলিয়ার একটি গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে এক পঞ্চমাংশ পাখি পরিত্যক্ত নাইলন/প্লাস্টিক জাল এবং প্লাস্টিক ব্যাগে আটকা পড়ে মারা যাচ্ছে। নায়লন/প্লাস্টিক জালে আটকা পড়লে পাখি নড়াচড়া করতে পারে না।

ঘ) প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়

- স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিল ও জলাশয়ের তীরভূমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- সীমিত ভাবে পলিথিন ব্যবহার করতে হবে এবং পরিত্যক্ত বর্জ্য যথা নিয়মে ধ্বংস করতে হবে।
- প্লাষ্টিকের পরিবেশ সম্মত বিকল্প উপাদান ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে।
- পৌরসভা ও আবাসিক এলাকায় প্লাস্টিকের পুন:ব্যবহার (Recycling) নিশ্চিত করতে হবে।

- সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিলের প্লাস্টিক বর্জ্য পরিষ্কার করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন সমূহের প্রয়োগ যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্লাস্টিক ও পলিথিন সামগ্রী ব্যাবহার সীমিত করতে হবে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইক্লিন (Recycling) করার জন্য বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার, উৎপাদন ও বিপণন হ্রাস করতে হবে।
- কারেন্ট জাল ও নাইলন নেট উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

পাখি সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

পাখি আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আপনারা জেনে খুশি হবেন বাংলাদেশ বন বিভাগ অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে বিশেষভাবে নিবেদিত। ইতোমধ্যে সারাদেশে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে প্রায় ১০০০০পাখি উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। পাখিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন-

১। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ সংসদে পাশ হয়েছে এবং উক্ত আইনের ১নং ও ২নং তফসীলে ৬৫০ প্রজাতির পাখি Protected Bird হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২। পরিযায়ী পাখি শিকার হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১(এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।

৩। সুন্দরবন ও টাংগুয়ার হাওড়কে Ramsar Site ঘোষণা করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৫টি এলাকাকে Flayway Site ঘোষণা করেছে এর মধ্যে টাংগুয়ার হাওড়, হাকালুকি হাওড়, হাইল হাওড়, সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ।

৫। সারাদেশে পাখি ব্যবসায়ীদেরকে বন্যপাখি ধরা বা বিক্রয় না করার জন্য সচেতনাতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation প্রদান করা হচ্ছে।

৭। স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য সারাদেশে সভা সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে।

৮। বিরল প্রজাতির শকুনের মরণঘাতী ঔষধ ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সুন্দরবন ও সিলেটের ২টি Vulture Save Zone ঘোষণা করা হয়েছে।

৯। সারাদেশে ৪টি অঞ্চলে উদ্ধারকৃত ও আহত পাখিকে সেবাদান করার জন্য বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার

আমরা প্রত্যেকেই যদি আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখিদের সংরক্ষণের গুরুত্ব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে। পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিযায়ী পাখির ইতিবাচক ভূমিকা সমন্ধে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদসহ সকলকে সোচ্চার হতে হবে। পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সমুদ্রতট, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি জলাভূমিতে পরিত্যক্ত প্লাষ্টিক বর্জ্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিষ্কার করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। পাখ-পাখালির কলতানে আমাদের দেশ ভরে উঠুক এই প্রতাশা করছি।

বলধা গার্ডেনঃ দুর্লভ উদ্ভিদের ঐতিহ্যবাহী জীবন্ত সংগ্রহশালা

মোল্যা রেজাউল করিম
পরিচালক, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা

বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার এক অপূর্ব সৃষ্টি বলধা গার্ডেন। শতাব্দী প্রাচীন জীবন্ত উদ্ভিদের সংগ্রহশালা, দুর্লভ, বিরল, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের মহাসমারোহ, নান্দনিক জীবন্ত উদ্ভিদ মিউজিয়াম নামে খ্যাত, সুদুর অতিতের এক টুকরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নাম বলধা গার্ডেন। মেগাসিটি ঢাকার বুকে ঐতিহ্যবাহী বলধা গার্ডেনটি একখন্ড সৌন্দর্য, একচিলতে প্রকৃতি, একফালী নাসারন্ধ্র, একমুষ্টি সবুজের আলপনা আর এক মুহুর্তকালীন নির্মল নিঃশ্বাসের প্রস্রবন হিসেবেই পরিগণিত। নান্দনিক এ প্রকৃতির অনবদ্য সৃষ্টির মাঝেই স্বগর্বে বেঁচে আছেন প্রয়াত জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, থাকবেন অনাদিকাল।

সুসাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, গীতিকার, প্রকৃতি প্রেমী ও উন্নত মননের অধিকারী জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী অতিযত্নে এ গার্ডেনটি গড়ে তোলেন। বর্তমান ঢাকা মহানগরীর ৮১ নং ওয়ার্ডের ওয়ারী এলাকায়, বঙ্গভবনের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে এই নান্দনিক কৃতি অবস্থিত। ১৯০৯ সালে বলধা গার্ডেন তৈরীর কাজের সুচনা হয়ে শেষ হয় ১৯৩৬ সালে। দীর্ঘ ২৮ বছরে পৃথিবীর ৫২ টি দেশ হতে দুর্লভ ও দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের বীজ ও চারা সংগ্রহ করে গড়ে তোলা হয় উদ্ভিদ সংগ্রহের এই অমর কৃত্তি। এটি এখন জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। দুটি অংশে বিভক্ত বলধা গার্ডেন। দক্ষিনের অংশটিই এ গার্ডেনের প্রথম ও মুল। জমিদার এই অংশের নামকরন করেন "সাইকী"। প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি এ বাগানটিকে আত্মার সাথে তুলনা করে এর নামকরণ করেন "সাইকি" বা আত্মা। গ্রীক মিথোলজিতে সাইকী হলেন "সুন্দরী দেবী"। নিজ হাতে তিনি এ বাগানের ডিজাইন তৈরী করেন। বাগানের ডিজাইনে আছে আরেক চমক। অত্যন্ত সুনিপুন হাতে অঙ্কিত "সাইকি"অংশের ডিজাইনটি নৃত্যেমঞ্চের আদলে তৈরী করা হয়েছে এবং এই ডিজাইন অনুস্মরনে রোপিত হয়েছে এর গাছপালা, তরুলতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদি। কেহ কেহ বলেন, "সাইকি"অংশের ডিজাইনটি গ্রীক নৃত্যের দেবীর আকৃতিতে করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে "সাইকি" অংশের বাগান সৃজনের কাজ শেষে জমিদার নবাব স্ট্রীটের উল্টো পাশে আর একখন্ড জমি ক্রয় করেন। "সাইকি" অংশের গাছপালার বংশবিস্তার ও নতুন নতুন সংগ্রহের গাছ রোপণের জন্য এ ভূমিখন্ডে বাগান সম্প্রসারণ করা হয়। তিনি এ অংশটির নামকরণ করেন "সিবিলী" যার অর্থ "প্রকৃতির মাতৃদেবী" (Mother Goddes of Nature)। এ ভূমিখন্ডের ক্রয়কালে এর উপর বিদ্যমান জলাশয়টির নামকরণ করেন "শঙ্খনদ" আর এরই পূর্বতীরে অবস্থিত এদেশের সর্বপ্রথম ও একমাত্র নিখুঁত সময়ের সূর্যঘড়ী যা আজও একই ধারায় নিখুঁত সময় দিয়ে মুগ্ধ করে দর্শনার্থীদের। ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিরল ও দুর্লভ সব উদ্ভিদের সমাবেশ ঘটিয়ে নান্দনিকতায় সাজানো হয় এই অংশটি। ১৯৪০ সালে জমিদারের একমাত্র পুত্র নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী (খোকাবাবু) ঘাতকের হাতে আকস্মাৎ নিহত হলে ভগ্নহৃদয় প্রকৃতি প্রেমিকের সৃষ্টিশীলতা থেমে যায়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মাথায় ১৯৪৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী।

এক অনবদ্য প্রকৃতি প্রেমের ভাস্বর উদাহরণ হলো বলধা গার্ডেন। বৃক্ষ ও প্রকৃতির মাঝে চিরন্তন ভালোবাসার শ্বাশ্বত বাণী নিজেই রচনা করেছেন এর রুপকার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী। তাঁর সমাধীগাত্রে উৎকর্ণ তাঁর নিজের লেখাটি তাই অবিস্মরণীয়-

" I am a passionate lover of nature!
With all he phases-my joy forever!
Lover of art, music, and literature,
Of highest human thoughts adorer
Pure truth, love, duty and devotion,
I revere as my soul-heart religion!
So varied a life's drama
Droppeth here its last curtain!
I have enough to it!
So wish me non-return again!
With all her best wishes for thee, passer-by
Drop me a flower! Good by!
Sincerely yours
-N. Roy"

জমিদার কর্তৃক এই বাগানের সহকারী তত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয় চিরকুমার অমৃতলাল আচারিয়াকে। এই অসাধারণ প্রকৃতি প্রেমী অমৃতলাল আচারিয়া ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত নিরলসভাবে তাঁর জীবনের শেষদিন অবধি এ বাগানের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে অমৃতলাল আচারিয়া মৃত্যুবরণ করলে এ বলধা গার্ডেনের তত্বধানের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে বনবিভাগ পালন করে। পুরাতন ঢাকার ওয়ারীতে খ্রিস্টান কবরস্থানের বিপরীত পার্শ্বে ৩.৩৮ একর (১.৫ হেক্টর) জায়গার উপর তৈরী করা হয় বলধা গার্ডেন। নবাব স্ট্রীট দ্বারা দুইটি অংশে বিভাজিত দুইটি খন্ডের একত্রিত নাম বলধা গার্ডেন। নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এর বাড়ী সংলগ্ন উল্টো দিকের প্লটটির নাম সাইকি। ১৯০৯ সালে সাইকীর নির্মান শুরু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে লতা, ঝোপ জাতীয় ইনডোর উদ্ভিদ (Indoor plants), অর্কিড, ক্যাকটাস, হাইড্রোফাইটস, একুয়েটিকস্, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ও বৃক্ষ প্রজাতী সংগ্রহ করে এ বাগানে এনে রোপণ করেন। ওয়ারীর নবাব স্ট্রীটের দুই পার্শ্বে অবস্থিত সাইকী ও সিবিলি দুটি অংশের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে "বলধা গার্ডেন"। বলধা গার্ডেন নামটি কিন্তু জমিদারের দেওয়া নাম নয়। বাগানের লে-আউটে প্লানের মধ্যে লুকায়িত আছে এর প্রতিষ্ঠাতার মননের অনবদ্য সুরলিপি।

১৩ আগষ্ট, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বৃক্ষ ও প্রকৃতি প্রেমিক জমিদারের মৃত্যুর পর কলকাতা হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রনে একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে বলধা গার্ডেন। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্থান সরকারের আমলে ঢাকার জেলার প্রশাসনের তত্বাবধানে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' (Court of Wards) এর ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হয় বলধা গার্ডেন। উক্ত সময়ে বাগানটির ব্যবস্থাপনায় চরম অচলাবস্থা দেখা দিলে বাগানের দুর্লভ প্রজাতীর অতিমূল্যবান, দুর্লভ ও বিরল উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য বলধা গার্ডেনটি ১৯৬২ সালে ন্যস্ত করা হয় বনবিভাগের হাতে। অদ্যাবধি বনবিভাগ সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্যানটির স্বকীয়তা ও দুর্লভ প্রজাতী বৈচিত্র্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিশেষ দৃষ্টিপাতের পর চলমান একটি প্রকল্পের আওতায় বলধা গার্ডেনের ব্যাপক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কাজ করা হয়েছে।

বলধা বাগানকে বলা হয় দুর্লভ ও বিরল উদ্ভিদের জীবন্ত অভিধান। অসংখ্য বিরল ও দুষ্প্রাপ্য প্রজাতীর উদ্ভিদের এ দুর্লভ সংগ্রহশালায় রয়েছে দেশি বিদেশী অর্কিড ও ক্যাকটাসের এক সমৃদ্ধ ভান্ডার। আছে নানা প্রজাতীর ইনডোর প্লান্টস, প্রায় ১২০ টি জলজ ট্যাংকিতে রয়েছে দেশী-বিদেশী নানান প্রজাতীর দুর্লভ লিলি, আমাজান লিলি, শাপলা, পদ্ম, শালুক, ঝাঝি, পাতাঝাঝি সহ একুয়েটিকস্, হাইড্রোফইটস ও মার্সিল্যান্ড উদ্ভিদ এবং

ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইডা। ক্যাকটাস হাউজে রয়েছে দুর্লভ ও দৃষ্টিনন্দন প্রজাতীর নানা আকৃতি ও প্রকৃতির ক্যাকটাস। এ বাগানে দুর্লভ সব পামগাছের বিশাল সংগ্রহ ছাড়াও রয়েছে ছায়াতরু, লতাগুল্ম, ঔষধী ও শোভাবর্ধক নানান প্রজাতী। এবাগানের বিশ্ববিখ্যাত ক্যামেলিয়া ফুলের সৌন্দর্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিমোহিত করেছিল।

বলধা গার্ডেনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ক) ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষনা-

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষনাপত্র পাঠ করা হয়। উক্ত ঘোষনাপত্রটি ঢাকার বলধা গার্ডেনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্থাপিত ই পি আর এর একটি ট্রান্সমিটার সেট হতে প্রচার করা হয় মর্মে জনাব শাহজাহান আবদালী তার "শতাব্দীর অগ্নিপুরুষ শেখ মুজিব" নামক গ্রন্থে নিম্নরুপ উল্লেখ করেছেন–

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ দুপুর ১২টার দিকে পাকিস্থানী সামরিক বাহিনী ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র দখল করে সেখানে বাঙালীদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। ঐদিন দুপুর দুইটার দিকে পাকবাহিনী কর্তৃক ২৫০ জন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার সংবাদ পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি **"ঢাকার বলধা গার্ডেনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ই পি আর এর একটি ট্রান্সমিটার সেট প্রস্তুত রাখা হয়"**। (পৃ; ৪৯)
রাত ১ টার দিকে গোলাগুলি ও বিচ্ছুরিত আলো বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে আসতে থাকলে তিনি সেখানে উপস্থিত তবিবুর রহমান রুনুকে জানতে চাইলেন,**"গোলাগুলি কোন্ ডাইরেকশন থেকে আসছে রে ?"। কিছুক্ষন পর বলধা গার্ডেন থেকে টেলিফোন এল, ওয়ারলেস সেটটা কোথায় রাখবো? এখানে আর যে টেকা যাচ্ছে না।"** তখন বঙ্গবন্ধু তাদের পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলতে বললেন। (পৃ: ৫০-৫১)

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে পাকবাহিনী প্রবেশের আগেই মধ্যরাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষনাপত্রটি প্রথমে বেতারে প্রচারের জন্য যোগাযোগ করা হলো। কিন্তু ততক্ষনে বেতার কেন্দ্র পাকবাহিনী দখল করে নিয়েছে। তাই বেতারে প্রচার করা সম্ভব হলো না। অবশেষে তিনি ঘোষনাপত্রটি চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচার করা যায় কিনা চেস্টা করলেন। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত চট্টগ্রাম বেতারে তার ঘোষনাপত্রটি বলধা গার্ডেনে রক্ষিত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পৌছে দিতে বললেন। এর আরেকটি কপি জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয় আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা ঘোষনাপত্রটির রেকর্ড বাজানো হয় বলধা গার্ডেনে রক্ষিত ট্রান্সমিটার থেকে। (পৃ: ৫১-৫২)

খ) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্মৃতিধণ্য বলধা গার্ডেন

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মহান স্মৃতিধন্য এ বলধা গার্ডেন। যতটুকু জানা যায়, এ মহান মানুষটির অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনের অনেক আলেখ্য জড়িয়ে আছে বলধা গার্ডেনের ঐতিহ্যের সাথে। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে বসবাস করতেন পুরানো ঢাকার নারিন্দা এলাকায়। প্রকৃতি প্রেমের অনবদ্য প্রেরণা থেকে তিনি সময়ে সময়ে ছুটে যেতেন বলধা গার্ডেনে, বসতেন গাছের ছায়ায়, লাভ করতেন ছায়া সুশীতল বৃক্ষছায়ার নির্মল নৈসর্গিকতা। কখনও কখনও তিনি তার সন্তানদের হাত ধরে বলধা গার্ডেনে ফুল পাখি ও গাছ দেখাতেন, চেনাতেন, প্রকৃতি প্রেমের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতেন তার ভবিষ্যত প্রজন্মকে। জানা যায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শৈশবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাত ধরে বলধা গার্ডেন পরিদর্শন করেছেন, গাছ চিনেছেন এই মহান পিতার নিকট হতেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শৈশবের স্মৃতিতে তাই অম্লান এই ঐতিহ্যবাহী বলধা গার্ডেন।

গ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর স্মৃতি বিজড়িত বলধা গার্ডেন

বলধা গার্ডেন দেশী-বিদেশী, দুষ্প্রাপ্য ও সহজলভ্য উদ্ভিদের এক মনোহর সমাবেশ। অনন্যসাধারন এ উদ্ভিদ মিউজিয়ামটি শুধুই সখের বাগান নয়, এটি শিক্ষা ও গবেষনার একটি অন্যতম পীঠস্থান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলধা গার্ডেন পরিদর্শনকালে বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন-

" কাটাতে আমার অপরাধ আছে, দোষ নেহি মোর ফুলে
কাটা অপ্রিয় থাক্ মোর কাছে, ফুল তুমি নিও তুলে।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৮) এই বলধা গার্ডেন পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেছিলেন, "বাংলাদেশে অনেক রাজ্য, জমিদার ও অভিজাতদের প্রাসাদেই তো ঘুরলাম, কিন্তু গাছপালা নিয়ে এমনভাবে সাজানো বাড়ি তো কোথাও দেখেনি। নরেন, কালি কলম দিয়ে আমি সারাজীবন যা করেছি, তুমি গাছপালা দিয়ে তাই করে চলেছ।" (বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, ১৯৯৭, পৃ: ২০৫-২০৬)।

ঘ) নোবেল বিজয়ী বাঙালী অমর্ত্য সেন সহ হাজারো কৃতী সন্তানের পদস্পর্শে ধন্য এই অনন্য সাধারণ বাগান। বলধা গার্ডেনের বৃক্ষছায়ে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল নোবেল বিজয়ী বাঙালী অমর্ত্য সেনকে। তিনি বলধা গার্ডেনে এসে এর নৈসর্গিকতা, বৃক্ষ বৈচিত্র্য, দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদের সমাহার, রোপণ বিন্যাস, পরিকল্পিত আচ্ছাদন ও সার্বিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বলধা গার্ডেনের উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বৃক্ষ ঃ ৫০০ টি
হার্ব ও স্ত্রাব ঃ ৫৮০০ টি
লতা (ক্লাইম্বার) ঃ ৪০০ টি
একুয়েটিকস্, হাইড্রোফইটস ও ব্রায়োফাইটস ঃ ২২০০ টি
অর্কিড ঃ ২৫০০ টি
ক্যাকটাস ঃ ৩০০০ টি
শোভাবর্ধক ঃ ২৭০০ টি
তৃণ ঃ ৩০০ টি
জেরোফাইটস (মরুসহিষ্ণু প্রজাতী) ঃ ৬০০ টি
সর্বমোট = ১৮০০০ টি

এ গার্ডেনের প্রায় সকল উদ্ভিদই বিরল প্রজাতির ও দুষ্প্রাপ্য। এখানকার অধিকাংশ উদ্ভিদই দেশের আর কোথায় পাওয়া যায়না। এছাড়াও রয়েছে মস, লাইকেন, ব্রায়োফাইটাস, টেরিডোফইটস, হাইড্রোফাইটস ও এ্যকুয়েটিকস।

- ❑ ঐতিহ্যবাহী ক্যামেলিয়া হাউজ, টাওয়ার হাউজ ও জয় হাউজ।
- ❑ ক্যামেলিয়া গার্ডেন।
- ❑ দুর্লভ আমাজান লিলি।
- ❑ দুর্লভ, বিরল ও অতিমূল্যবান প্রজাতির ১৮২০০ টি উদ্ভিদের সংগ্রহ।
- ❑ বুড়িগঙ্গা নদীতে যাওয়ার গোপন সুড়ঙ্গ পথ।

বাংলাদেশের প্রথম ও নিখুঁত সূর্যঘড়িটি বলধা গার্ডেনে আবস্থিত। সুনিপুন কারুকার্য ও সুবৈজ্ঞানিক মানমাত্রার বিচারে এটিই এখনও পর্যন্ত অনন্য ও অনবদ্য। জমিদার নরেন্দ্র নারায়ন রায়চৌধুরীর এ অনবদ্য সৃষ্টি কালের পরিক্রমায় এখনও মানোর্ত্তীর্ণ। বলধা গার্ডেনের সিবিলী অংশের পুকুরপাড়ে এর অবস্থান। সূর্যালোকের সাহায্যে এত নিখুঁত সময় নির্ণায়ক যন্ত্রটি সত্যিই একটি বিস্ময়। বলধা গার্ডেনে নানারুপ সৌন্দর্যের বিলাসী সমাবেশে সূর্যঘড়ি এক অনন্যসাধারণ সংযোজন। জমিদারের মনন ও মেধার বহিঃপ্রকাশ এ সৃষ্টি। বিরল ও নান্দনিক পত্র পল্লবের মাঝে এ হৃদয়হারী সংযোজন দেশের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ বলধা গার্ডেনকে করেছে আরও আকর্ষণীয়, আরও মনোহর, মনোমুগ্ধকর।

উপসংহার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের অধীন বন অধিদপ্তরের এ ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ সংগ্রহশালাটি বনবিভাগ তথা বাংলাদেশের গর্ব ও একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। বনবিভাগ লালিত বলধা গার্ডেন জাতীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশে রুপান্তরিত হয়েছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় দুস্প্রাপ্য উদ্ভিদের এই আবাসস্থলটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে লাখো বাঙালীর মননের পরিস্ফুরণ। বলধা গার্ডেনের ছায়াতলে স্নাতহতে ব্যকুল হৃদয়ে তাই এখনও ছুটে আসেন দেশ-বিদেশের হাজারো বৃক্ষপ্রেমি মানুষ। জীবনের ক্লেদ ও বঞ্চনা ভুলে ক্ষনিকের তরে হলেও অবগাহিত হন প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতার সরোবরে। তাই জাতীয় এই সম্পদের সুষ্ঠ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বলধা গার্ডেনকে "বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য" হিসেবে ঘোষণার আহবান জানাচ্ছি।

বলধা গার্ডেনের প্রাচীর

সূর্যঘড়ি

নরেন্দ্র নারায়ন রায়চৌধুরীর সমাধী ফলক

বিরল ফুল কমব্রিটাম

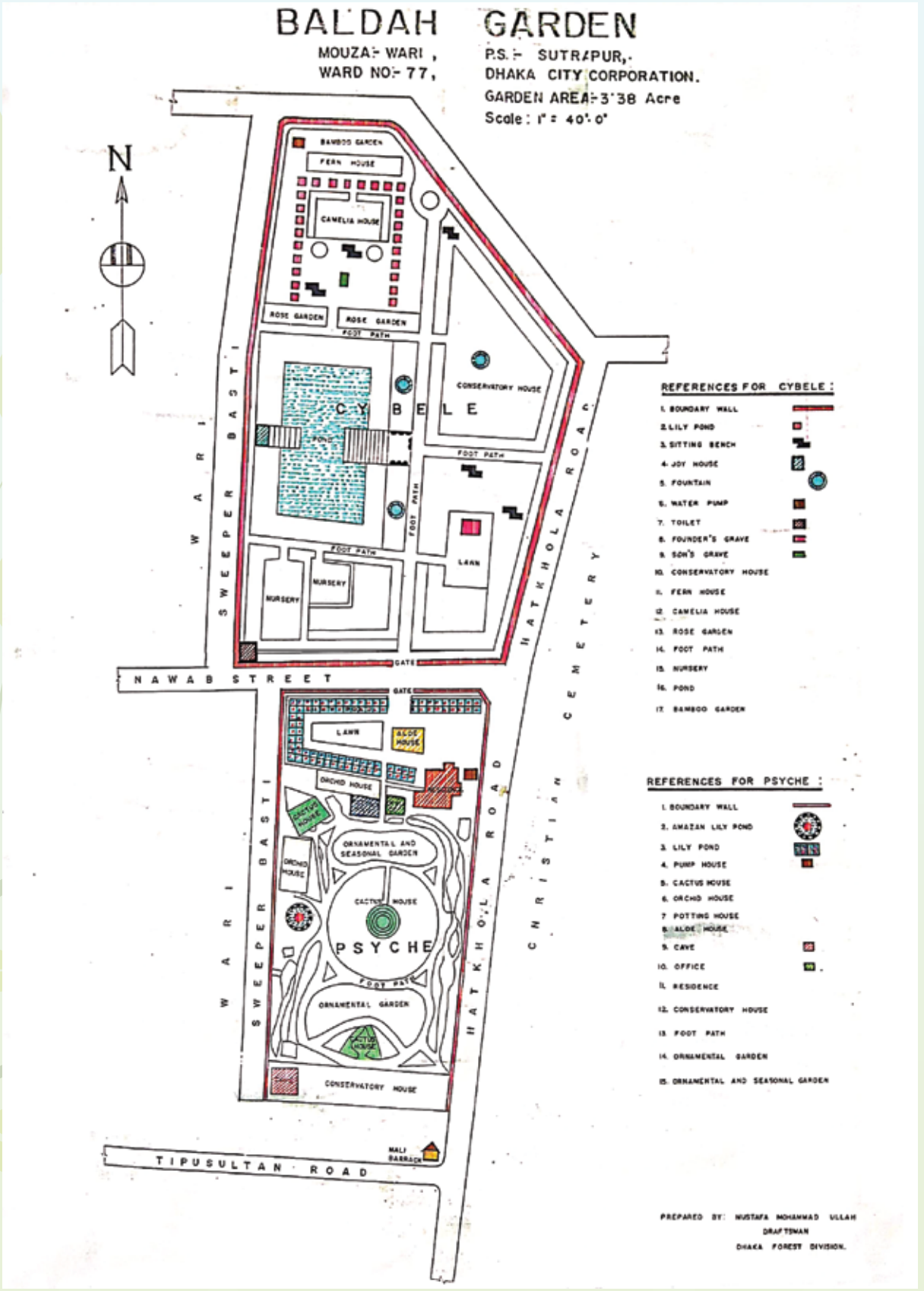

BALDAH GARDEN
MOUZA:- WARI ,
WARD NO:- 77 ,
P.S. :- SUTRAPUR,-
DHAKA CITY CORPORATION.
GARDEN AREA:- 3·38 Acre
Scale : 1" = 40'· 0"
N
CYBELE
PSYCHE
NAWAB STREET
TIPUSULTAN ROAD
HATKHOLA ROAD
WARI SWEEPER BASTI
CHRISTIAN CEMETERY
REFERENCES FOR CYBELE :
1. BOUNDARY WALL
2. LILY POND
3. SITTING BENCH
4. JOY HOUSE
5. FOUNTAIN
6. WATER PUMP
7. TOILET
8. FOUNDER'S GRAVE
9. SON'S GRAVE
10. CONSERVATORY HOUSE
11. FERN HOUSE
12. CAMELIA HOUSE
13. ROSE GARDEN
14. FOOT PATH
15. NURSERY
16. POND
17. BAMBOO GARDEN
REFERENCES FOR PSYCHE :
1. BOUNDARY WALL
2. AMAZAN LILY POND
3. LILY POND
4. PUMP HOUSE
5. CACTUS HOUSE
6. ORCHID HOUSE
7. POTTING HOUSE
8. ALOE HOUSE
9. CAVE
10. OFFICE
11. RESIDENCE
12. CONSERVATORY HOUSE
13. FOOT PATH
14. ORNAMENTAL GARDEN
15. ORNAMENTAL AND SEASONAL GARDEN
PREPARED BY: MUSTAFA MOHAMMAD ULLAH
DRAFTSMAN
DHAKA FOREST DIVISION.

রূপময় লাউয়াছড়া

ড. রেজা খান
বন্যপ্রাণী গবেষক ও প্রকৃতি প্রেমিক

রেল লাইনের রেইল ধরে বেশ কসরত করে আমরা কয়েকজন হেঁটে চলছিলাম শ্রীমঙ্গল থেকে না জানা দূরত্বের লাউয়াছড়া বনের উদ্দেশ্যে। সেটা ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি। চারপাশটা কুয়াশায় একেবারেই ঢেকে ছিল। কখনো দু রেইল থেকে দুজনে হাত ধরাধরি করেই চলতে হচ্ছিল, কারণ আমরা কেউই রেল লাইনে বিছানো পাথর-নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে অভ্যস্ত নই ।প্রায় দু ঘন্টা আলো-আঁধারির মাঝ দিয়ে পথ চলার পর আমরা যেন হঠাৎই গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলাম। আরো একটু এগুতেই আমরা বুঝতে পারলাম রেল লাইনটি চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। আর এটাই লাউয়াছড়া বন। সে কী গভীর বন! ভয়ে যে গা শিউরে ওঠেনি সেটা বলব না, কারণ অমন ঘন কুয়াশায় কখনো কোনো অজানা বনে ঢুকিনি। কপাল ভালো। আমাদেরকে গাইড করার জন্য পুরোধায় ছিলেন অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা। যতদূর মনে পড়ে নটর ডেম কলেজের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষ মিলিয়ে আমরা মোট ১৮ জন ছাত্র ছিলাম। এর মধ্যে বারো জনই ছিলাম বিএসসি প্রথম বর্ষে। অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা স্যার আমাদেরকে উদ্ভিদবিদ্যা এবং ফাদার আর ডব্লিউ টিম পড়াতেন প্রাণিবিদ্যা। এ কলেজের শিক্ষাসফরের উদ্দেশে এবং দ্বিজেন স্যারের অনুপ্রেরণায় আমরা প্রথম যাই কক্সবাজার, সেখান থেকে রামু, সোনাদিয়া দ্বীপ ও মহেশখালী হয়ে শ্রীমঙ্গল এসে হাজির হই। তখন একদিনে এক মাঝিচালিত এক সাম্পানে স্যার ও কলেজের গবেষণাগার সহযোগীসহ মোট ২০ জন সোনাদিয়া-মহেশখালী ট্রিপ করেছিলাম। মূলত লাওয়াছড়া বন দেখা, এর উদ্ভিদকূলের ওপর প্রাথমিক অনুসন্ধান চালানো, কলেজ গবেষণাগারের জন্য কিছু নমুনা সংগ্রহ এবং ইপিটিআরএস বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান চা গবেষণাকেন্দ্র দেখা যেহেতু স্যারের এক পুরনো ছাত্র ওখানকার দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি স্যারকে দাওয়াত করেছিলেন।

পশ্চিম ভানুগাছ বনের ভেতরে অবস্থিত লাউয়াছড়া বনের একটি বিট অফিস রেল লাইন যে পাহাড়কে ভেদ করে দ্বিখন্ডিত করেছে তার এক পাড়ের টিলার ওপরে এক ফরেস্টারের ঘর ও অফিস এবং অন্যটিতে বহু পুরনো টিনের ঘরের বন বাংলো। আমরা অনেকটা ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন বাংলোর দোরগোড়ায় পৌঁছালাম তখন ওখানে আমাদের আগেই পোঁছে গেছেন বয়স্ক মতন দেখতে কুমিল্লাবাসী দাঁড়িওয়ালা একজন ফরেস্টার। তিনি যেন আমাদের পেয়ে চাঁদ পেলেন। কারণ ও জামানায় উনারা বন বিভাগীয় সরকারি অফিসার এবং চা বাগানের বাড়তি মেহমান কালেভদ্রে দু-চার মাসে একবার দেখতে পেতেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর উপরের টিলার বাসা থেকে মুড়ি, এক কাদি পাহাড়ি বাংলা কলা এনে সামনে রেখে দিলেন। আর আমরা তা গোগ্রাসে খেলাম-যেহেতু পাহাড়ি পথে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ৭-৮ কিলোমিটার হেঁটেছি। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৮৩ সালে যখন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল আইন চিড়িয়াখানার পাখির কিউরেটর হিসেবে যোগ দিলাম, তখন কুমিল্লার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। তিনি আমাদের ১৯৬৭ সালে লাউয়াছড়া সফরের কথা শুনে বললেন, ওখানে তখন ফরেস্টার হিসেবে ওনার শ্বশুর সাহেব ছিলেন এবং অমন অবসরে যাবার দাঁড়িওয়ালা ফরেস্টারের সংখ্যা খুবই কম ছিল। খুব ভালো লাগল দৈবাৎ সংযোগের জন্য।

বাংলো থেকে নেমে আমরা হাঁটা দিলাম রেল লাইন ধরে পশ্চিম ভানুগাছের দিকে। মাঝে মাঝে লাইনের ধারের ঢালু মেঠোপথ বেয়ে আমরা স্যারের নেতৃত্বে বনে ঢুকেছিলাম। তিনি প্রতিটি গাছ, গুল্ম এবং বীরুতের বৈজ্ঞানিক নাম অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছিলেন-যার বেশিরভাগই আমাদের কারো বোধগম্য হচ্ছিল না। সেই ১৯৬৭ সালে লাউাছড়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ঠিক এক দশক পর, ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, তৃতীয়বার ও বনে ঢুকি-ওসময় ঢাকার এডভেন্টিস্ট ডেন্টাল ক্লিনিকের দাঁতের ডাক্তার যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড এল জনসনের সঙ্গে পাখি

দেখার জন্য। দু দিন ধরে বাংলো থেকে তিন-চার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বন চষে বেড়িয়ে আমরা বহু প্রজাতির পাখি দেখি যার কমপক্ষে এক ডজন আমরা এর আগে কখনো দেখিনি।

এরপর নানা গবেষণার কাজে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বেশ ক বার ও বনে যাবার সুযোগ হয়। এরপর থেকে প্রতি দু বছরে দু-তিনবার করে লাওয়াছড়া ও তার আশেপাশের বনে এবং হাওরে গিয়েছি বা এখনো যাচ্ছি।১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত দেশের বনাঞ্চলে ব্যাপক ঘোরাঘুরির ফলে আমি এটা নিশ্চিত হই যে পুরাতন কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে হবিগঞ্জ হয়ে শ্রীমঙ্গল এবং মৌলভীবাজার ও সিলেট সদরের যে অংশ ভারতীয় সীমানা বরাবর এবং সেখানে যে ৫-৬ খন্ড ১০ থেকে ৩০ বর্গকিলোমিটার করে মিশ্র চিরসবুজ বন। তাতে লাউয়াছড়া বা এর বন্যপ্রাণীর বিষয়টি নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বারংবার। সেসময় ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা অ্যানিমেল প্লানেট চ্যানেল ছিল না, বা তার উপমহাদেশে প্রচারিত হতো না। ফলে 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' খুবই সারা জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। এরপর থেকে এটি স্তন্যপায়ী এবং পাখি গবেষক ও পর্যবেক্ষকদের এক স্বর্গপুরীতে রূপ নেয়। তারপর দেখা যায় এটা ব্যাঙ ও সাপদেরও এক আপন ভুবন। সরকারের বনবিভাগ এর জীববৈজ্ঞানিক মূল্য বিচার করে ১৯৯৬ সালে পশ্চিম ভানুগাছ সংরক্ষিত বনের ২৭.৪ বর্গ কিলোমিটারের প্রায় অর্ধেকটা, মানে ১২.৫ বর্গকিলোমিচার, জায়গাকে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে। এটি হয়ে ওঠে সারাদেশের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী দর্শনের এক প্রসিদ্ধ স্থান।

অপরিপক্ক ও সঠিক তথ্যনির্ভর নয়-এমন সব সস্তা লেখালেখির ফলে জনমনে এমন বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, লাউয়াছড়া তথা পশ্চিম ভানুগাছ সংরক্ষিত বন একটি প্রাকৃতিক বন। আসলে বর্তমান বাংলাদেশের কোথাও এক খন্ড বন নেই-যাকে আদি প্রাকৃতিক বন মানে ভার্জিন বন বলা যাবে। বা যে বনে বনবিভাগের হস্তক্ষেপে প্রাকৃতিক বন কেটে সেখানে তাদের পরিকল্পিত বা পছন্দের অথবা বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায়-এমন দেশি ও বিদেশি গাছের প্রজাতি না লাগানো হয়েছে বা বনে বাস করা আদি জনগোষ্ঠীর জুমচাষের শিকার হয়ে বন ধ্বংস হয়নি। বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে বন ধ্বংসের গোড়াপত্তন করে ব্রিটিশ।

১৮৬৪ সালে প্রথম বন বিভাগের সৃষ্টি হয়। তখন এর প্রধান ছিলেন ব্রান্ডিস। এরপর ১৮৭২ সালে শ্লিক বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং তাঁর সময়ে অবিভক্ত বাংলার বনকে ৫টি বন বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এর একটি ছিল ঢাকা বিভাগ-যার অধীনে আসে সিলেট এবং কাছার অঞ্চল। আসাম ফরেস্ট রেগুলেশন ১৮৭৫-৭৬ বরাতে সিলেটের বনকে প্রথমে 'সংরক্ষিত বন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যতদূর জানা যায়, সি পুরাকায়স্থ নামের একজন সিলেট অঞ্চলের ১৯৩৫-৩৮ সালের জন্য একটি 'প্ল্যান্টেশন স্কীম' তৈরী করেন। ১৯৩৮ সালে সিলেট বন বিভাগের জন্য এন এন দাশ নামের একজন বন কর্মকর্তা ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সালের জন্য একটি 'ওয়ার্কিংপ্লান' তৈরি করেন। আর সেই ১৯৩৫ সাল থেকে নানান পরিকল্পনার নামে সিলেট অঞ্চলের প্রাকৃতিক বন কেটে সেখানে ব্রিটিশরা চাহিদা পূরণের জন্য নতুন বন সৃজন করা হয়। সম্ভবত ১৯৫৯ সালে ভানুগাছের বন সর্বশেষ পাইকারিভাবে কেটে সেখানে নতুন গাছ লাগানো হয়। যে কোন কারনেই হোক এ যাবৎ পর্যন্ত ঐ বনের গাছ ব্রিটিশের চালু করা 'ক্লিয়ারফেলিং' বা মাটিবাদে বাকি সব গাছ কেটে সাবাড় করে সেখানে পছন্দ ও প্রয়োজনের জন্য বাণিজ্যিক বন সৃজন করা হয়নি। ফলে লাউয়াছড়ায় বহু প্রাকৃতিক এবং স্থানীয় উদ্ভিদের প্রজাতির পুনর্জন্ম হয়েছে এবং বনটিকে দেখতে প্রায় প্রাকৃতিক বনের মতো লাগে।

এবার মানচিত্রে লাউয়াছড়ার ওপরে আসুন। ভানুগাছ বাদে বাকি সব জায়গা জুড়ে হয় জনবসতি, ফসলি জমি নয়তো চা বাগান। অর্থাৎ ১৯৩৫ থেকে কম করে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এ এলাকার তাবৎ বন কেটে বা দখল করে সেখানে গড়ে উঠেছে মানুষের বাসস্থান। মানচিত্রের গভীরে বা লাউয়াছড়ার মাঝখান দিয়ে হাঁটলে দেখা যাবে আদিবাসীদের 'অধিকারের' অংশ হিসেবে বনের গাছ কেটে বা ছেঁটে খাসিয়া ও ত্রিপুরিদের পছন্দ ও প্রয়োজনের তাগিদে কিছু গাছ রেখেছে পান চাষের জন্য। বাকি বন উজাড় করা হয়েছে। আশেপাশের বাঙালিরাও বনভূমি

দখল করতে কম যায়নি। এসব বারোয়ারি চাপের মুখে উজাড় হয়ে যাওয়া বনের বা প্রাকৃতিক জঙ্গল ঝোপঝাড়ের বেশিরভাগ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে লাউয়াছড়ায়।

প্রাণী জগতের নিচের দিক থেকে ধরলে এ বনে সবচেয়ে বেশি আছে কেঁচো ও তদজাতীয় প্রাণী, শামুক এবং খোলসহীন শামুক বা স্লাগ, অসংখ্য ধরনের পিঁপড়ে, প্রজাপতি, দেয়ালি পোকা বা মথ, ফড়িং, ঘাসফড়িং ফলং উড়চোঙ্গা, গোবরে, জোনাকি, গান্ধী ও ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সা, চেল্লা, বিছা বা বিচ্ছু, কেন্নো, উইপোকা, মিঠাপানি ও ভূমি কাঁকড়া। তার সঙ্গে আছে মশা-মাছি। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে ব্রিটিশামলের দেশি ও বিলেতি বিজ্ঞানীরা বেশকিছু অমেরুদন্ডী প্রাণীর আদি প্রজাতি নমুনা সংগ্রহ করে সিলেট জেলা তথা শ্রীমঙ্গল থেকে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে আমি এমন একটি প্রজাতির নমুনার ছবি তুলি ও পুনঃরেকর্ড করি প্রায় শত বছর পর। ১৯০০ সালে ভারতকেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পোকক্ সিলেটের শমসের নগর থেকে পাওয়া নমুনার ওপর ভিত্তি করে ছুরি বিচ্ছু বা হুইপ স্করপিয়নটির (Hypoctonus oatesii) নামকরণ ও প্রজাতি স্থাপন করেন। এরপর আর আমাদের দেশের কোনো বিজ্ঞানী এ প্রজাতির হদিস করেনি। ব্যাঙ-টিকটিকি-পোকামাকড় প্রভৃতি খোঁজার সময় হঠাৎ করেই এ প্রজাতির একটি নমুনার দেখা পাই, ছবি তুলি এবং যেখানে ছিল সেখানেই ফেরত রাখি। এ ব্যাপারে ছবিসহ একটি খবর ২০০৯ সালের ২৬ জুলাই ডেইলি স্টার পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর ওখান থেকেই আমি একটি ঘাতক গান্ধীপোকা বা এসাসিন বাগের সন্ধান পাই, যার এখনো প্রজাতি নির্ণয় সম্ভব হয়নি। আরো নানান ধরনের অমেরুদন্ডী এ বনে আছে-যাদের খুঁজে বের করা দরকার এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসবের মধ্যে অনেক প্রজাতি পাওয়া যাবে বা শতাধিক বছরের পুরনো রেকর্ড নতুন করে ঝালাই করা যাবে।

জাহাঙ্গীরনগর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দুটির প্রাণীবিদ্যার বেশ কয়েকজনশিক্ষক ও প্রাক্তন গবেষক ব্যাঙ, টিকটিকি, আঁচিল বা আনজন এবং সাপের বেশ কটি প্রজাতির নতুন রেকর্ড করেছেন বাংলাদেশের জন্য। উভচর দলের খুব একমজার প্রাণী Smith's Litter Frog Leptobrachium smithii. এর আগে ২০০৭ সালে আচমত এবং মান্নান যার বাংলা নাম রাখেন, সরাসরি ইংরেজি নামানুসারে ও অনুবাদ করে 'স্মিথের আবর্জনা ব্যাঙ'। যেহেতু দেশে এদের কেবল একটি মাত্র প্রজাতি আছে তাই ২০১০ সালে আমার চেকলিস্টবইয়ে একে আমি কেবলই আবর্জনা ব্যাঙ বলেছি। কিন্তু এ ছোট আকারের ভীষণভাবে নিশাচর ব্যাঙটির চোখের ওপরের প্রায় অর্ধেকটা লাল দেখাতে পারে। সে হিসেবে এক 'লালচোখা ক্ষুদে ব্যাঙ' বলাই ভালো। রাতের আঁধারে বনের মেঝেতে ঘুরে বেরিয়ে কীট-পতঙ্গ এবং কেঁচো জাতীয় প্রাণী ধরে খায়। গেছো ব্যাঙ বা তাদের দোসরদের বেশ কটি প্রজাতিও এখানে পাওয়া যায়। বর্ষার সময় এবং বিশেষ করে বৃষ্টি হলে সূর্য ডোবার সময় থেকে প্রায় সারারাত ব্যাঙের দারুণ চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। রাতের বেলা জোনাকির বিচ্ছুরিত আলোকছটায় বনে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকায়। কখনো বা শোনা যায় ঝিঁঝিপোকা বা ঘাসফড়িংদের ডাক। গেল বছরই একজন তরুন সরীসৃপ গবেষণাকারি শাহরিয়ার সিজার এ বন থেকে দুটি বিরল প্রজাতির সাপ: বলয়ী দুধরাজবা বান্ডেড ট্রিস্কেট স্নেক এবং ঝলমলে সাপ বা ইরিডেসেন্ট স্নেকের নমুনা সংগ্রহ করে দেশের জন্য প্রথম রেকর্ড করেছে। এর আগে অধ্যাপক মুনিরুল এবং আলী রেজা কম করে ৩টি ব্যাঙের এবং ৬টি টিকটিকি-আঁচির জাতীয় সরীসৃপ রেকর্ড করেন।

লাউয়াছড়াকে বলা যায় পাখির জন্য বাংলাদেশের নুহ নবীর নৌকো বা স্বর্গরাজ্য। এখানে প্রায় ২৫০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। শীতের রৌদ্র উজ্জ্বল এক দিনে আমার মতো লোকেরাই ৫০ থেকে ৭০ প্রজাতির পাখি রেকর্ড করতে পারে আর উঠতি বয়সের পাখিপ্রেমীরা যে সে সংখ্যা শতের কাছে নেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লাউয়াছড়ার স্বাক্ষর প্রজাতি বা সিগনেচার স্পিসিস বলতে উল্লুক বা ওয়েস্টার্ন হুলক-কে বোঝায়। ধরে নেয়া হয় সারাদেশে ২৫০টির মতো উল্লুক আছে। বৃহত্তর সিলেট জেলা বা সিলেট বন বিভাগ; ৩টি পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার যে মিশ্র চিরসবুজ ও ক্ষয়িষ্ণু বন সেখানে। এর মধ্যে কেবল লাউয়াছড়াতেই আছে ৫৭টি

(তথ্য: বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট)। এটি দেশের উল্লুকদের সবচেয়ে বড় দল-যা মোট ১৪টি ছোট ছোট উপদলে এবং প্রতিটি দল আলাদাভাবে বনের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে। এর মধ্যে ৩ থেকে ৫টির একটি দল থাকে লাউয়াছড়া বন বিভাগীয় বাংলোর আশেপাশে-যা পর্যটকরা সচরাচর দেখে থাকেন। অল্প বা প্রায় বিনা পরিশ্রমে উল্লুক দেখার জন্য মোক্ষম জায়গা দেশে খুব কম আছে।

বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বেশী বানর-নরবানর বৈচিত্র্য বিদ্যমান এই লাউয়াছড়াতেই- যা আমি ও আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ফরীদ আহসান এবং আব্দুল ওয়াহাব ১৯৮০-র দশকে নির্ণয় করি। এ বন থেকে নতুন করে দেশের জন্য বিগত ২০১০ সালে সি এম রেজা নামের একজন ব্যাংকার হলুদ গাছ গোকুল বা ইয়েলো-থ্রোটেড মার্টেন দেখেন এবং ছবি তোলেন।

এক কথায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ও তার পাশে যে সামান্য বন এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তা যে আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি স্বর্ণখনি তা বলাই বাহুল্য। ফলে এটিকে দেশের প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যের একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে এ জাতীয় উদ্যানে সব রকম জমি বা সম্পদ ভাগাভাগির সব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাতিল করে কেবলই সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে পুনঃঘোষণা করা দরকার-যেখানে শুধুমাত্র সঠিত ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বনের উদ্বৃত্ত সম্পদ কেবল মাত্র তৃণমূল পর্যায়ের লোকজনদের মধ্যে কাজের বিনিময়ে বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চতকরণ প্রয়োজন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর তখনই এ বন বন্যপ্রাণী, স্থানীয় প্রকৃতি এবং জনগণের সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশের মানুষের কল্যাণে আসবে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত।

COMMUNITY-FOCUSSED FOREST GOVERNANCE INSTITUTIONS: SOME REFLECTIONS

Professor Niaz Ahmed Khan, Ph.D.
University of Dhaka

Since the intensification of participatory approaches to forest management in the 1980s, community-based institutions (notably, 'local beneficiary groups' in the Participatory Forestry (PF) programmes and Co-management institutions in the Protected and National Park areas) have been formed and various institutional platforms for the interaction between the Bangladesh Forest Department (BFD) and local communities constituted with a varying degree of success and effectiveness. As regards the actual functioning and surrounding working contexts of these community level governance institutions, the following observations may be noted:

(i) Participatory Forestry (PF) has clearly benefited the participants (to use the official term - 'beneficiaries') in the form of cash income; in a considerable number of cases, such financial benefits have been substantial.

(ii) Beyond the sharing of income, however, the extent of community participation has been somewhat limited: members of communities especially women have little or no role in the planning and formulation stage of the projects, and in the key operational decisions; their engagement has mainly been in the forms of labour inputs to the plantation and associated physical implementation activities.

(iii) PF and Co-management programmes have contributed to the increased social status and recognition of the participating farmers. The majority of respondent participants reported to have cherished a sense of recognition and esteem by their peers and villagers (outside the project territory), which is manifested by such incidents as: more visits by relatives (kith and kin); invitation to socio-religious events; marriage connections to well-off families; and wider access to public offices and other formal quarters.

(iv) In general, collective activities seem to have intensified as an effect of the participatory programmes. In a few instances, as observed during the field work, the participants have emerged as a `power group' in the local government elections and, therefore, have received increased attention from the local political leadership (including elected Membership in the Union Parishads (UP); we noted women CMC members getting elected to UP in Mymensingh, and we have been informed that their CMC

connections and network had played an important role in this regard.

(v) Some social structures and dynamics – most notably patronage relations and influences - are manifest in the study area. Some examples include:

- ✡ Some farmers maintain regular contact with matobbar or karbari (local elite/leaders) to access and exploit political power;
- ✡ Farmers are selected for inclusion in the project by a specialized commit tee, consisting of representatives from the BFD, local government offices and community institutions. For example, one PF participant in … was brought to the project by a local elite (a local traders with a background of holding a local government office in the past) for whom he used to work before (as a sharecropping tenant – barga farmer/kamla): "[I] worked in his [the patron's] grocery shop...He [referred me] to some of the 'big people' in the project, and [accordingly] I came here and got this land...I do not know much about any committee or any meeting;...if there is a problem, I go to him."
- ✡ Many PF participants take recourse to informal loans and assistance from Mohajons (local money lenders) that require collateral in the form of a `social reference' from local elites.

(vi) In some instances, participatory project interventions have given the relatively well-off farmers (e.g. those with better economic situation, or connections with local political and project leadership) some opportuni ties of interaction with the 'formal' sectors of, for example, the public and local government offices, markets and hospitals. Women and poorer farmers can hardly avail themselves of this opportunity of external exposure. However, they occasionally attempt to negotiate access to formal sectors through their dominant colleagues in such (formal) social or economic transactions as selling agroforestry products to traders and their agents, securing public extension services.

(vii) Considerable number of the respondent participants of PF feels insecure about title to land.

As evident from the above, there already exists a set of relevant community based institutions in the field with varying degrees of success. Rather than inventing the wheel and try out new institutional structures, while introducing any new project, we may consider utilizing the suitable existing institutions – of course, with necessary adaptations, adjustments, and contextualization. This will also ensure long term sustenance of these institutions. While formulating and implementing relevant programmes, there have been limited understanding and

focus on the social structures and dynamics, and their influences and implications for the performance of these programmes. It is imperative, therefore, to take full account and consideration of the social dynamics and their implications during any programme design and execution.
Ensuring a reasonable security as regards access, tenure, and usufruct of land for the participating communities is crucially important.

Although, as noted above, there has been an overall shift of the BFD towards more participatory approaches (as manifested in the introduction of PF and co-management programmes) since the 1990s, the actual level and intensity of interaction with the local community vary widely across different sites, and generally remain somewhat limited. In this regard, as revealed during the fieldwork and various stakeholder consultations, the co-management institution of Co-management Committee (CMC) seems relatively better performing compared to the Samity under the auspices of the PF programmes (see Tables 1 and 2).

Table 1: Pattern and Extent of Interaction between BFD & CBOs: The Case of CMC

Indicators	Responses
Participation in planning and designing	Almost all members participate
	Majority participate
	A few participate
CMC & BFD jointly allocate funds and decide on utilization	Always
	Occasionally
	Rarely
Number of joint decisions by BFD & CMCs	More than 80% in last 12 months
	Between 50-80%
	Less than 50%
Participation of line agencies and NGOs in the CMC work	**Major line agencies and NGOs**
	Only a few of them
	None or very limited
Plans responsive of local contexts/changes	Mostly flexible and responsive
	Partially responsive
	Imposed, inflexible

Note: The responses – reflecting the majority view - are put in bold.
Source: (i) Based on the 'assessment framework' development by Khan (2010); (ii) Information is drawn from the discussions in stakeholder consultations in Tangail-Mymensingh and Chittagong, and associated visit to selected co-management and PF programme sites.

Table 2: Pattern and Extent of Interaction between BFD & CBOs: The Case of PF Beneficiary Groups (Samity)

Indicators	Responses
Participation in planning and designing	Almost all members participate
	Majority participate
	A few participate
Samity & BFD jointly allocate funds and decide on utilization	Always
	Occasionally
	Rarely
Number of joint decisions by BFD &*Samity*	More than 80% in last 12 months
	Between 50-80%
	Less than 50%
Participation of line agencies and NGOs in the Samity's work	Major line agencies and NGOs
	Only a few of them
	None or very limited
Plans responsive of local contexts/changes	Mostly flexible and responsive
	Partially responsive
	Imposed, inflexible

Note: The responses – reflecting the majority view - are put in bold.
Source: (i) Based on the 'assessment framework' development by Khan (2010); (ii) Information is drawn from the discussions in stakeholder consultations in Tangail-Mymensingh and Chittagong, and associated visit to selected co-management and PF programme sites.

- The field BFD and associated NGO staff concerned with the delivery of participatory and co-management projects should be adequately trained and oriented with (i) relevant community mobilization and development (including group formation and nurturing), (ii) participatory methodology and approaches (including community-led critical/problem analysis); and (iii) supervision and monitoring tools and techniques (including field-based reporting).

- Wherever possible, local knowledge and wisdom (including some of NRM technologies observed during the fieldwork) may be analyzed, documented, disseminated and promoted.
  Greater emphasis should be given on forging network and partnerships on the part of the relevant local institutions (CMC, Samity, etc.). During group

discussions, a number of leaders of such institutions requested the BFD and/or Project's support in linking up to the national level – e.g. to the national media and television networks – for projecting the site-specific activities and accomplishments, and promoting community rights and access to forest resources.

- ✡ Exposure and 'cross' visits may be further expanded involving more zealous group and committee members (as well as relevant local government and traditional leaders) in order for them to visit and benefit from the experiences of better functioning situations and cases. Essentially, the purpose of these visits is to facilitate cross fertilization of good practice idea and create a demonstration effect.

- ✡ The efforts to record and document the existing best practice examples of off-and on-farm avenues of livelihood and income diversification should be continued, and correspondingly reviewed for possible replication and further promotion.

Dr. Niaz Ahmed Khan is Professor and former Chairman, Department of Development Studies, University of Dhaka and former Country Representative-Bangladesh, International Union for Conservation of Nature (IUCN). *This paper draws on the author's recent engagement with the UN-REDD Programme in Bangladesh as the Lead on the Forest Governance Study and the associated report. The author acknowledges the inputs from the UN-REDD study and remains thankful to the concerned UN-REDD and BFD officials and local interview respondents.*

সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

নির্মল কুমার পাল
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা

ভূমিকা

সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এ বনের জীববৈচিত্র্য বিশ্বের যে কোন ম্যানগ্রোভ বনের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমের উপর পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নির্ভরশীল। সমগ্র সুন্দরবনকে ১৯৯২ সালের রামসার সাইট (Ramsar Site) এবং সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক 'বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা' (World Heritage Site) ঘোষণা করার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নির্মল ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশ, অসংখ্যা নদ-নদী ও খালের বিস্তৃতি, স্থানীয় বনজীবিদের মাছ, মধু ইত্যাদি সম্পদ আহরণের ঐতিহ্যবাহী কৌশল সমগ্র বিশ্বের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সুন্দরবনের পর্যটক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দর্শনার্থীদের অপরিকল্পিত ও আকস্মিক ভ্রমণ তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এবং সুন্দরবনের পরিবেশ বিনষ্ট করছে। সুন্দরবনের প্রাচীনতম ঐতিহ্য, মর্যাদা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোকনে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দর্শনার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নীতিমালার উদ্দেশ্য

১. সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।
২. সুন্দরবনে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা।
৩. পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান করে সুন্দরবন ভ্রমণকে উপভোগ্য করে তোলা।
৪. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা এবং বনজ সম্পদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে তাদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বাঘের আবাস ভূমি ও সমৃদ্ধতম জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণের শত বছরের কৃতিত্ব বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা।
৬. সুন্দরবন সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় জীবনধারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালার মূখ্য বিষয়

১. পর্যটনের কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া যাতে বিঘ্নিত হতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
২. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নৌ চলাচলের অনুমতি ব্যতীত কোন পর্যটকবাহী জলযানকে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৩. সুন্দরবনে অবস্থানকালীন সময় জলযানে পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় মজুদ থাকতে হবে।
৪. সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রেখে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত আকারে সুন্দরবন ভ্রমণ অনুমোদন করা যাবে।
৫. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য দর্শনার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করতে হবে। বন বিভাগের নির্ধারিত ষ্টেশনসমূহে উল্লিখিত ফি আদায় করা হবে।
৬. সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী এলাকার পর্যটন কেন্দ্র যেমন করমজল, মুন্সীগঞ্জ বা সমমানের এলাকা ব্যতীত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গমন এবং রাত্রি যাপনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
৭. অভয়ারণ্যসমূহে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ, স্বাভাবিক আচরণ, প্রজনন, বংশ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা, অপ্রাপ্ত বন্যপ্রাণীর লালন-পালন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৮. সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার পর্যটক ধারণ ক্ষমতার মধ্যে পর্যটক সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।
৯. সুন্দরবন ভ্রমণের নূন্যতম ৩ দিন পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।
১০. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও জীবন মানের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
১১. সুন্দরবন ভ্রমণকালে প্রচলিত বন আইন, বন্যপ্রাণী আইনসহ সংশ্লিষ্ট বিধি এবং বনকর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। যেখানে সেখানে অবতরণ, বিচরণ ও অবস্থান করা যাবে না।
১২. বনাভ্যন্তরে অগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো হাতিয়ার, ফাঁদ, বিষ ইত্যাদি বহন করা যাবে না এবং মাছ বা বন্যপ্রাণী শিকার/ধরার সহায়ক কোন সরঞ্জাম বহন করা যাবে না।
১৩. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কোন মাইক/মাইক্রোফোন জাতীয় শব্দযন্ত্র বহন করা যাবে না। বনের নির্জনতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে হবে।
১৪. পর্যটকবাহী লঞ্চ চলাচলের জন্য নির্ধারিত রুট (Route) অনুসরণ করতে হবে।
১৫. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য পর্যটক, ট্যুর অপারেটর এবং বন বিভাগকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।
১৬. সর্বোচ্চ ৫০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত দোতলা লঞ্চ/জলযান পর্যটকসহ সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারবে। লঞ্চের ব্রীজটি তৃতীয় তলায় থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তৃতীয় তলায় কোন কেবিন থাকবে না।
১৭. লঞ্চ/জলযানে দিনে সর্বোচ্চ ১৫০ জন পর্যটক বহন করা যাবে এবং রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে লঞ্চ/জলযানে সর্বোচ্চ ৭৫ জন পর্যটক বহন করা যাবে।
১৮. পর্যটকবাহী লঞ্চ/জলযান সর্বোচ্চ ৪ রাত ৫ দিন পর্যন্ত সুন্দরবনে অবস্থান করতে পারবে। গবেষণার জন্য বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে নূন্যতম প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দরবনে অবস্থান করা যাবে।

পর্যটকদের দায়িত্ব

১. সুন্দরবন ভ্রমণের নূন্যতম ৩ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে অনুমতি গ্রহণ করা।
২. সুন্দরবনে প্রবেশের প্রাক্কালে অনুমতিপত্রে উল্লেখিত বন স্টেশনে লঞ্চ/জলযানসহ উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত যাবতীয় রাজস্ব পরিশোধ করা। ভ্রমণ শেষে নির্দেশিত ষ্টেশনে পাশ সমর্পণ করা।
৩. সুন্দরবনে প্রবেশপথে বা অবস্থান/ভ্রমণকালে বনকর্মী বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক পর্যটন সেবার মান যাঁচাই বা সুন্দরবনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যাঁচাই কল্পে নৌযান পরিদর্শনকালে পূর্ণ সহযোগিতা করা।
৪. অভয়ারণ্য এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত পৃথক এন্ট্রি ফি প্রদান করা।

৫. সুন্দরবনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানের প্রয়োজন হলে নিকটস্থ বন কর্মকর্তার নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানিয়ে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদানসহ অনুমতি গ্রহণ করা। কোনভাবেই তা সর্বোচ্চ নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত হবে না।

৬. সুন্দরবনে প্রবেশ করার পর জলে/স্থলে কোনভাবেই কোন আবর্জনা না ফেলা এবং জলযানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

৭. বন বিভাগের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সুন্দরবনে রাত্রিযাপন না করা।

৮. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছাত্র/ছাত্রীদের হ্রাসকৃত রাজস্ব পরিশোধের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে ভ্রমণকারীদের তালিকাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ করা। প্রতি ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবক হিসেবে নূন্যতম একজন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা।

৯. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কর্তব্যরত বন কর্মচারীদের সাথে শোভনীয় আচরণ করা এবং দায়িত্বরত বন কর্মচারীর উপদেশমূলক নির্দেশনা প্রতিপালন করা।

১০. সুন্দরবন ভ্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা। সুন্দরবনের জলে স্থলে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

১১. সুন্দরবনে দলছুট অবস্থায় একাকী চলাফেরা না করা। সাগর, নদী বা খালের পানিতে অবতরণ না করা এবং গোসল করা ও সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকা।

১২. সুন্দরবনের প্রাণীকূল ভয় পেতে পারে কিংবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা।

ট্যুর অপারেটরদের দায়িত্ব

১. স্বাভাবিক মাত্রার অধিক শব্দ সৃষ্টিকারী, অতিরিক্ত/কালো ধোয়া উদগীরণকারী বা ত্রুটিপূর্ণ কোন জলযান পর্যটক পরিবহনে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং পর্যটকবাহী লঞ্চে বর্জ্য রাখার ব্যবস্থা রাখা।

২. পর্যটকদের সুন্দরবনে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় বনে প্রবেশের পূর্বেই জলযানে মজুদ রাখা।

৩. পর্যটকবাহী নৌযানে পর্যটক ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও লাইফ জ্যাকেটসহ অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং শয়ন ও বিশ্রামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা।

৪. পর্যটকবাহী লঞ্চে সৌর শক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট থাকা। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে শব্দ সৃষ্টিকারী জেনারেটর বহন থেকে বিরত থাকা। রাত ১০ টার পর জলযানে ব্যবহৃত জেনারেটর বন্ধ রাখা।

৫. পর্যটকবাহী জলযানে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার জীবিত গরু/ছাগল/মহিষ/ভেড়া জাতীয় প্রাণী বা উল্লিখিত প্রাণীর মাংস বা রেড মিট বহন না করা।

৬. প্রতিটি জলযানের সাথে ছোট ইঞ্জিন/হস্তচালিত নৌকা/স্পীডবোট বহন করা এবং মূল জলযান/লঞ্চ থেকে ছোট নৌকা/স্পীডবোটে নিরাপদে উঠানামার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. প্রতিটি পর্যটকবাহী জলযানে নূন্যতম একজন প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড এবং ৪০ জনের অধিক পর্যটকের জন্য নূন্যতম দুই জন প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড রাখার ব্যবস্থা করা।

৮. সুন্দরবন ভ্রমণকালীন বনের বিভিন্ন স্থাপনা (জেটি, পন্টুন, ওয়াচ টাওয়ার, বিশ্রামাগার, ফুট ট্রেইল ইত্যাদি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করা।

৯. সুন্দরবন প্রবেশ ও নির্গমন কালে নির্ধারিত ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র প্রদর্শন ও সরকারী রশিদ এর বিপরীতে রাজস্ব/ফি পরিশোধ করা।
১০. পর্যটকবাহী জলযানে বন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখা। নিরাপত্তারক্ষীর কক্ষে কোনো পর্যটক প্রবেশ/অবস্থান না করার বিষয় নিশ্চিত করা।
১১. সুন্দরবন প্রবেশ পথে বা প্রবেশের পর যে কোন স্থানে বনকর্মী/আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃক জলযান তল্লাশীকালে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।
১২. সুন্দরবনের যেখানে সেখানে অকারণে লঞ্চ/জলযান নোঙড় না করা। পর্যটকবাহী মূল জলযান বন বিভাগের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত জেটি বা পন্টুনের সাথে বাঁধা থেকে বিরত থাকা।
১৩. বনাভ্যন্তরে রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটকের সংখ্যা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত রাত্রিকালীন ধারণ ক্ষমতা বা ৭৫ জন (যেটি কম) এর অধিক না রাখা।
১৪. সুন্দরবনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানের প্রয়োজন হলে নিকটস্থ বন কর্মকর্তার নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানিয়ে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদানসহ অনুমতি গ্রহণ করা। তবে কোনভাবেই তা সর্বোচ্চ সময়সীমার অধিক হবে না।
১৫. বন অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা গেলে বা আলামত পাওয়া গেলে নিকটস্থ বন অফিসে তা অবহিত করা এবং অপরাধ/দুর্ঘটনা উদঘাটন বা প্রতিরোধে বন কর্মীদেরকে সহযোগিতা করা।
১৬. সুন্দরবন ভ্রমণে অনুসরণীয় বিষয় এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা।
১৭. আবহাওয়া ও জোয়ার ভাটার সময়সূচী অনুসরণ করে পর্যটকদের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক রাখা।
১৮. বন কর্মীদের অবহিত না করে পর্যটকদেরকে ছোট নৌকা, স্পীডবোট ইত্যাদি যোগে বা পদব্রজে সুন্দরবনের যত্র-তত্র ভ্রমণে বিরত থাকা।
১৯. অনুমতিপ্রাপ্ত নির্ধারিত রুটের বাহিরে ভ্রমণ না করা।
২০. সুন্দরবনে অবস্থান কালীন সময় বন বিভাগের কোন স্থাপনার ক্ষতি করা হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া।
২১. সুন্দরবনের প্রাণীকূল ভয় পেতে পারে কিংবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা।

বন বিভাগের দায়িত্ব

১. সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে একদিনের (২৪ ঘন্টা) মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা।
২. সরকারি ছুটি বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভ্রমণকারীদের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ ও অনুমতিপত্র ইস্যুর ব্যবস্থা করা।
৩. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য প্রবেশ ফি, জলযান রেজিষ্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য যে কোন ধরণের আদায়যোগ্য ফি এর একটি তালিকা বিভাগীয় দপ্তরে এবং পর্যটকদের প্রবেশ পথের ষ্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।
৪. সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পটে কতগুলো লঞ্চ/জলযান অবস্থান অনুমোদনযোগ্য তা নির্ধারণ করে যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৫. পর্যটকগণ যাতে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ সম্পন্ন করতে পারে সে বিষয়ে ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকদের সহযোগিতা করা।
৬. সুন্দরবনে দর্শনীয় স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও রুট ম্যাপ সম্বলিত বুকলেট পর্যটকদের প্রদান করা (মজুদ থাকা সাপেক্ষে)।
৭. প্রবেশ ফি আদায় এবং কোন কারণে জলযান তল্লাশীকালে যাতে পর্যটকগণ অযথা হয়রানীর সম্মুখীন না হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৮. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ অঞ্চলে/জায়গায় সুন্দরবনে ভ্রমণকালে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে পর্যটকদের সতর্কতা মূলক নির্দেশনা (ইংরেজী ও বাংলায়) প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

৯. বন আইন, ১৯২৭ বা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি/নীতিমালা পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

১০. নীতিমালার যেকোন শর্ত ভঙ্গের জন্য ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ/জলযানের সুন্দরবনে ভ্রমণের রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা জরিমানা আদায় করা।

১১. অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি স্টেশনে অভিযোগ বাক্স স্থাপনের ব্যবস্থা করা। পর্যটকদের নিকট হতে বন কর্মীর আচরণ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১২. আপদ ও দূর্যোগকালীন সময়ে যথা- যান্ত্রিক ত্রুটি, আকস্মিক দুর্ঘটনা, ভুলপথে চালিত নৌযানকে সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করা।

১৩. সুন্দরবন ভ্রমণের রুট নির্ধারণ করা এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশের উভচর প্রানী

ডঃ মোঃ কামরুল হাসান
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মূলত উভচর প্রাণী বলতে বোঝায় "মেরুদন্ডী প্রাণী যাদের জীবনচক্রের যেকোন একটি পর্যায়ে পানি অত্যাবশ্যকীয়"। সাধারণত উভচর বলতে আমরা ব্যাঙের বিভিন্ন প্রজাতিদেরকেই বুঝি। ব্যাঙ ছাড়াও আমাদের দেশে আরও দুই প্রজাতির উভচর আছে যারা সিসিলিয়ান (Caecilian) নামে পরিচিত। ব্যাঙের মত এদের কোন পা থাকেনা এবং এরা দেখতে অনেকটা কেঁচোর মত।

উভচর প্রাণীদের জীবনচক্রে মূলত দুটি কারণে পানি অত্যাবশ্যকীয়। প্রথমত এদের ডিমের নিষেক প্রক্রিয়া স্ত্রী ব্যাঙের দেহের বাহিরে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ স্ত্রী ব্যাঙ ডিম ছাড়ার সময় পুরুষ ব্যাঙ ডিমের উপর শুক্রানু বা Sperm নির্গত করে। এই নিষেক প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত ব্যাঙের ডিম এনঅ্যামনিওটিক ধরণের অর্থাৎ এদের ডিমের বাহিরে প্রতিরক্ষামূলক আলাদা পর্দা থাকে না, ফলে পানি ছাড়া যদি শুষ্ক স্থানে এরা ডিম পাড়ে বা ডিম ছাড়ার পর সেই স্থানের পানি রোদে শুকিয়ে যায় তবে ব্যাঙের ডিমও শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য গেছো ব্যাঙরা এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। এরা পানির উপর কোন গাছের ডাল বা পানিতে ভাসমান কোন উদ্ভিদ বা ভাসমান কোন বস্তুর সাথে ফোমের তৈরী বাসায় মধ্যে ডিম দেয়। পুরুষ ব্যাঙটিও সেই ফোমের বাসায় শুক্রাণু নির্গত করে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ব্যাঙের নিষিক্ত ডিম থেকে ২-৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙাচি ফুটে বের হয়। ব্যাঙাচিরা পানিতে ২৪-৫০ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করার পর তাদের রুপান্তর সম্পন্ন হয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের আকৃতি পায়।

বাংলাদেশে ৪৯ প্রজাতির ব্যাঙ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রয়েছে ২ প্রজাতির সিসিলিয়ান, ২ প্রজাতির কুনোব্যাঙ এবং ৪৫ প্রজাতির অন্যান্য ব্যাঙ। আমাদের বাড়িঘরের আশেপাশে সচরাচর ১৬ প্রজাতির ব্যাঙ পাওয়া যায়। এ ব্যাঙগুলোর মধ্যে কুনোব্যাঙ, কটকটি ব্যাঙ, ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, চিনা ব্যাঙ, দুই ডোরা পাতা ব্যাঙ, পানা ব্যাঙ ও ডোরাকাটা গেছো ব্যাঙ অন্যতম।

বাংলাদেশের বনভূমিগুলোতে ৪৪ প্রজাতির ব্যাঙ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৩০ প্রজাতির ব্যাঙ শুধুমাত্র বনভূমিতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এদের আবাসস্থল বনভূমি কেন্দ্রিক, বনের বাহিরে এদের দেখতে পাওয়া যায় না। বনভূমিতে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় এধরণের ব্যাঙের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ, ছাগল-ডাকা ব্যাঙ, সরুমাথা ব্যাঙ, কোপ-এর ব্যাঙ, ভাঁমো ব্যাঙ, বড় চিনা ব্যাঙ ও বিভিন্ন প্রজাতির গেছো ব্যাঙ অন্যতম।

বনভূমির কোন কোন ব্যাঙ শুধুমাত্র তাদের প্রজনন ঋতুতেই (বর্ষাকালে) দেখা যায়। প্রজনন ঋতুর বাইরে এদের দৃষ্টিগোচর হয়না কারণ এরা গর্তবাসী বা (Fossorial)। বছরের বেশিরভাগ সময় এরা পঁচাপাতা বা নরম মাটির নীচে গর্তে বাস করে। এ ধরণের ব্যাঙগুলোর মধ্যে পটকা ব্যাঙ, ভেঁপু ব্যাঙ ও লাল চোখা ব্যাঙ অন্যতম। ঘন বর্ষায় (জুন-জুলাই) সন্ধ্যায় এ ব্যাঙগুলো উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করে বনভূমি মাতিয়ে রাখে। পুরুষ ব্যাঙের ডাকাডাকিতে স্ত্রী ব্যাঙ মিলনে আকৃষ্ট হয়। বর্ষাকালে বনভূমিতে যেসব জায়গায় পানি জমে সেখানে ব্যাঙের মেলা বসে।

ব্যাঙের কয়েকটি প্রজাতি যেমন ঝরনা সুন্দরী ব্যাঙ, সবুজ পিঠ ব্যাঙ ও মুকুট ব্যাঙ আমাদের পাহাড়ি বনভূমিতে ঝরনার আশেপাশে পাওয়া যায়। ঝরনার প্রবাহমান পানিতে যাতে এরা ভেসে না যায় সেজন্য গেছো ব্যাঙের মত এদের হাতপায়ের আঙ্গুলে চাতকির মত থাকে যা দিয়ে এরা পাথরের গায়ে নিজেদের শক্তভাবে আটকে রাখতে পারে।

China Bang_*Microhyla ornata*

Gecho Bang_Nest_*Polypedates leucomystax*_Egg nest JU_M.K.Hasan (1)

Gecho bang_*Polypedates leucomystax*

ব্যাঙ আমাদের প্রকৃতির বন্ধু। এরা পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বলা হয়ে থাকে একটি ব্যাঙ প্রতিদিন তার শরীরের ওজনের সমপরিমাণ পোকামাকড় খেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে ব্যাঙ যে পোকাগুলো খায় তার বেশীর ভাগই আমাদের ফসল ও গাছের জন্য ক্ষতিকর পোকা। সুতরাং ব্যাঙ আমাদের অজান্তেই কৃষকের ফসল রক্ষার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

পরিবেশে ব্যাঙ কমে যাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আশির দশকের দিকে বাংলাদেশ থেকে ব্যাঙ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাঙ ধরে রপ্তানি করা হতো। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরিবেশে ব্যাঙ কমে যাওয়ায় ক্ষতিকর প্রভাব চোখে পড়ে। ব্যাঙ কমে যাওয়ায় দেশে ফসলের জন্য কীটনাশক আমদানি আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়। একটি হিসাবে দেখা যায়, বিগত কয়েক বছরে ব্যাঙ রপ্তানি করে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছিল শুধুমাত্র অতিরিক্ত কীটনাশক আমদানিতে তার চেয়ে অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ সরকার ব্যাঙ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের সকল ব্যাঙ "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২" দ্বারা সংরক্ষিত।

আইন দ্বারা সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাঙের বংশ বিস্তার ও টিকে থাকার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। জলাভূমির পরিবেশ দূষণ, বনভূমি ধ্বংস, ফসলের জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার এই হুমকীগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের পাহাড়ি অনেক অঞ্চলেই খাওয়ার জন্য নির্বিচারে ব্যাঙ ধরা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাঙের উপকারী ভূমিকা তুলে ধরে সচেতনা বৃদ্ধিই পারে প্রকৃতির পরম বন্ধু "ব্যাঙ" রক্ষা করতে।

Kotkoti Bang
E. cyanophlyctis

Kotkoti bang (mating)
E. cyanophlyctis

Lal-chokh Bang (Lawachara)
Leptobrachium smithi

Sobuj Bang
Euphlyctis hexadactylus

Sona Bang
Hoplobatrachus tigerinus

জিম করবেট

ড. মনিরুল খান
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট এর পুরো নাম এডওয়ার্ড জেমস করবেট। তিনি ১৮৭৫ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নৈনিতালে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম ক্রিষ্টফার গার্নি। করবেট ছিলেন পিতামাতার অষ্টম সন্তান। তাদের ছিল দুটি পৈত্রিক বাড়ি। গ্রীষ্মকালে তারা থাকতেন নৈনিতালের বাড়িতে, আর শীতকালে নৈনিতাল থেকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত কালাঢুঙ্গি গ্রামে। করবেট নৈনিতালের স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে ১৮৯৫ সালে রেলওয়ের খন্ডকালীন চাকরী নেন। এরপর বিভিন্ন সময় ফুয়েল ইন্সপেক্টর, গুদাম রক্ষক, ষ্টেশন মাষ্টার ইত্যাদি নানাবিধ পদে চাকরী করেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে অংশ নেন এবং সর্বশেষ লেফটেন্যান্ট কর্ণের পদে উর্ণীত হন। করবেট এবং তান বড় বোন ম্যাগি দুজনেই অবিবাহিত জবিন কাটিয়ে গেছেন এবং আজীবন পরস্পরের সঙ্গী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে করবেট ও ম্যাগি স্থায়ী ভাবে আফ্রিকার কেনিয়া চলে যান। যাওয়ার আগে পৈতৃক বাড়ি দুটি বিক্রি করে যান। এই বিখ্যাত শিকারীর মৃত্যু হয় কেনিয়াতে, ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে।

1-Jim Corbett when older
Copyright-Monirul Khan

করবেট এর প্রথম শিকার কাহিনী 'ম্যান-ইটার্স অব কুমায়ুন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। প্রথম বইটি তিনি লিখেছিলেন অনেকটা বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে। বইটি প্রকাশের পর তার চমৎকার লেখনি ও ঘটনার নাটকীয়তা এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, পরবর্তীতে প্রকাশকের তাগিদে লেখেন 'দ্য ম্যাস-ইটিং লেপার্ড অব রুদ্রপ্রয়াগ', 'মাই ইন্ডিয়া', 'জাঙ্গল লোর' এবং 'দ্যা টেম্পল টাইগার এ্যান্ড মোর ম্যান-ইটার্স অব কুমায়ন' শিরোনামে কয়েকটা শ্বাসরুদ্ধকর শিকার কাহিনী। করবেট তার দীর্ঘ শিকার জীবনে অনেক মানুষখেকো বাঘ ও চিতাবাঘ শিকার করেছেন। শেষ জীবনে করবেট ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ উদ্দ্যেগী হন। করবেট এর সম্মানে ভারত সরকার কুমায়ুন অঞ্চলের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় উদ্যানের নামকরন করেন 'জিম করবেট জাতীয় উদ্যান' যার আয়তন ৫২১ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়া তার কালাঢুঙ্গির বাড়ীটি 'জিম করবেট যাদুঘর' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমি করবেট এর শিকার কাহিনীর এক মহাভক্ত। এর প্রধান কারণ শিকার কাহিনীর সাথে তিনি চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন বুনো অবস্থায় বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আচরণ এবং প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল করবেট এর শিকার-রাজ্যে গিয়ে তার বর্ণনাকৃত জায়গাগুলো দেখা। গত ২০০৬ সালের নভেম্বরে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার নামক সংস্থার আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম দিলি । ওখান থেকে করবেট জাতীয় উদ্যান গাড়ীতে ছয় ঘন্টার পথ। দিলির কাজ সেরে সোজা চলে গেলাম করবেট এর শিকার-রাজ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে। আমি যখন করবেট জাতীয় উদ্যানের নিকটবর্তী এক ট্যুরিষ্ট কটেজে পৌছলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। ভাগ্য ভাল কটেজের ম্যানেজার তখনও জেগে ছিলেন।

পরদিন ভোরের আলো ফোঁটার আগেই ক্যামেরা ও বাইনোকুলার সহ প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম নিয়ে তৈরী হলাম। ভোরের আলো ফোঁটা মাত্রই বারান্দায় এসে দাড়ালাম। আহ্, সে কি দৃশ্য। কুমায়ুন এর বিস্তীর্ণ পাহাড়শ্রেণীর ওপাড়ে আকাশ রক্তিম রং ধারণ করেছে। আমার চোখের সামনে অরণ্যঘেরা এই সেই পাহাড়শ্রেণী যেখানে ৭০/৮০ বছর আগে জিম করবেট ঘুরে বেড়িয়েছেন মানুষখেকো বাঘ আর চিতাবাঘের সন্ধানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় একজন গাইডকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম শালবন সমৃদ্ধ পাশের পাহাড়ে। এখানকার

শাল গাছগুলো প্রকান্ড আকৃতির। বনের পথে চলতে গিয়ে দেখলাম বাঘ এক জায়গায় মলত্যাগ করে রেখেছে। তার পাশে বাঘের কিছু আচড়ও আছে। বনে হনুমানের সংখ্যা বেশ আছে। বনের ভেতর বাহারী রঙের অনেক পাখি দেখলাম। বড় পাখিদের মধ্যে বনমোরগ আর ময়ূর বেশ আছে। করবেট প্রায় প্রতিদিনই এমন বনমোরগ আর ময়ূর শিকার করতেন মাংসের জন্য। বনের ভেতর দিয়ে একটি খাড়া পাহাড়ের কোল ঘেষে হাটতে হাটতে চমৎকার এক নদীর ধারে বের হলাম। নদীর নাম কোশি। হিমালয় পর্বতের বরফ গলা স্বচ্ছ জলরাশি বয়ে চলেছে নূড়ি-পাথরে ভরা এই নদী দিয়ে। নদীর উপর একটা প্রাচীন ঝুলন্ত সেতু। গাইড বললো জিম করবেটের সময় এই সেতু ছিল। এমন এক ঐতিহাসিক সেতুর সামনে তো নিজের একটা ছবি না তুললে চলে না। আমরা নদীর তীর ধরে হাটতে থাকলাম উজানের দিকে। এক জায়গায় পায়ে চলা পথটি চলে গেছে পাহাড়ের খাড়া ঢাল দিয়ে। ওখান থেকে নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেশ কয়েকটা মহাশোল (ইংরেজিতে যাকে বলে 'মাহসির') মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সফটিক স্বচ্ছ পানিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের সোনালী-সাদা দেহ। আকৃতিতে এই মাছ কিছুটা মৃগেল মাছের মতো, তবে খেতে খুবই সুস্বাদু। করবেট তার লেখার অনেক জায়গায় বড়শি দিয়ে এই মহাশোল মাছ শিকারের কথা লিখেছেন। হাটতে হাটতে বেশ কিছুটা পথ পাড়ী দেওয়ার পর নদীর একটা বড় বাঁকে পৌছলাম। এখানে এক অদ্ভূত মন্দির দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। মন্দিরটা আসলে অদ্ভুত না, অদ্ভুত হচ্ছে এর অবস্থান। বহু পুরানো এই হিন্দু মন্দিরটা নির্মিত হয়েছে নদীর মাঝখানে বেশ উঁচু আর চোখা একটা দ্বীপের উপর। কিভাবে যে এত দীর্ঘকাল স্রোতস্বিনী এই নদীর মাঝখানে এমন এক দ্বীপ টিকে আছে তা এক রহস্যময় ব্যাপার। ভক্ত হিন্দুদের মতে ভগবান নিজে একে রক্ষা করে রেখেছেন। নদীর কূল ছেড়ে আমরা বনের পথ ধরলাম। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর আমরা মোহন নামের একটা জায়গায় পৌছলাম। জায়গার নামটা আমার অতি পরিচিত কারণ এই জায়গায় করবেট একটা মানুষখেকো বাঘ মেরেছিলেন। মোহন থেকে আমরা ভিন্ন পথে সরাসরি কটেজে ফিরে এলাম।

2-Author in Corbett National Park
Copyright-Monirul Khan

3-Hindu temple at the top of a strange riverine island in Corbett National Park=Copyright-Monirul Khan

রাত হলো, কিন্তু ঘুমানোর সুযোগ পেলাম না। মাঝরাতে উঠে তৈরি হয়ে রাত্রি চারটার সময় জীপে রওনা হয়ে গেলাম করবেট জাতীয় উদ্যানের কেন্দ্রীয় এলাকার উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় এলাকায় জীপ ছাড়া অন্য কোনভাবে ঘোরা নিষেধ। সেটা বড় সমস্যা নয়, বড় সমস্যা হলো প্রতিদিন মাত্র বিশটি জীপ প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের জীপ জাতীয় উদ্যানের ভেতর ঢুকলো। নুড়ি পাথর আর মাটির উপর দিয়ে কোনমতে জীপ চলার পথ। অনেক জায়গায় ঘন জঙ্গল আর উঁচু নলবনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। তবে মাঝখানের জায়গাটা বেশ খোলামেলা। বনের ভেতর একটা মোড় ঘুরতেই প্রকান্ড এক দাতাল হাতির মুখোমুখি হলাম। আমাদের জীপের মাত্র ৩০ ফুট সামনে মুখোমুখি দাড়িয়ে হাতি! উত্তেজিত হয়ে সে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করছে প্রকান্ড গজদন্ত দুটো দুলিয়ে। জীপের ড্রাইভার বেশ অভিজ্ঞ। বিপদ টের পেয়েই সে জীপ দ্রুত ঘুরিয়ে

উল্টোদিকে রওনা দিল। এক জায়গায় পথের উপর বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ দেখে আশান্বিত হয়ে উঠলাম। আফসোস এই যে শেষ পর্যন্ত বাঘের দেখা পেলাম না।

কটেজে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বের হয়ে গেলাম ১৫ কিলোমিটার দূরে কালাঢুঙ্গিতে ('কালাঢুঙ্গি' অর্থ 'কালোপাথর') অবস্থিত জিম করবেট এর শীতকালীন বাড়ী দেখতে। এটি বর্তমানে 'জিম করবেট যাদুঘর'। এই বাংলোটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯২২ সালে। করবেট এই বাড়িতে থেকেই বেশিরভাগ শিকার করেছেন এবং শিকার কাহিনী লিখেছেন। ঘরের ভেতর করবেট এর ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, বিছানা, তৈজসপত্র, ঔষধের বোতল ও হারিকেন সহ বিবিধ জিনিস সাজানো রয়েছে। এছাড়া বিশেষ কয়েকটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে করবেটের ব্যবহৃত টুপি এবং হাতের লেখার নমুনা। এছাড়া যে ফায়ারপেসের পাশে বসে করবেট শীতকালে অনেক সময় কাটিয়েছেন সেটিও আছে।

4-Fresh pugmarks of tiger in Corbett National Park=Copyright-Monirul Khan

5-Goods that were used by Corbett=Inside Corbett's residence=Copyright-Monirul Khan

পরদিন কটেজের ম্যানেজার এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লালকুয়া ট্রেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। লালকুয়া এসে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল আগ্রার কাছাকাছি স্টেশন মথুরার উদ্দেশ্যে। ব্যাগ থেকে করবেটের লেখা 'ম্যান-ইটার্স অব কুমায়ুন' বইটি বের করলাম। এটি আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবার আরাম করে ট্রেনে বসে বইটি পড়া শুরু করলাম। আগেও বইটি পড়েছি, কিন্তু এবার মনের পর্দায় দেখতে পেলাম প্রতিটি মুহূর্ত।

বিদেশি ক্ষতিকর উদ্ভিদ

প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র দাস
কনজারভেশন বায়োলজি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ ইউনিট
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বগতভাবে পৃথিবীর কোনো উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী প্রজাতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। একটি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যতগুলো জীব প্রজাতি বসবাস করে- তারা প্রত্যেকেই সেই বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিতে পারে তখনই- যখন একটি উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী প্রজাতি এক বাস্তুতন্ত্র থেকে ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে কিংবা তার বিস্তার এলাকার বাইরে সম্পূর্ণ নতুন এলাকায় যেয়ে বংশবৃদ্ধি শুরু করে দেয়। নতুন বাস্তুতন্ত্রে কিংবা এলাকায় আগমনকারী প্রজাতিকে বলা হয় পরক প্রজাতি (এলিয়েন স্পিসিস)। অনেক সময় এসব পরক প্রজাতি স্থানীয় অন্যান্য প্রজাতির জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। পরক প্রজাতির দ্রুত বংশবৃদ্ধিজনিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিঘাতে স্থানীয় প্রজাতি বিনষ্ট হলে কিংবা তার দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হলে এই ধরনের পরক প্রজাতিকে আগ্রাসী পরক প্রজাতি (ইনভেসিভ অ্যালিয়েন স্পিসিস) বলা হয়। জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের জন্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ যে পাঁচটি কারণ পৃথিবীতে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে আগ্রাসী পরক প্রজাতি।

বাংলাদেশে আগ্রাসী পরক প্রজাতি সম্পর্কে গবেষণা অপ্রতুল। তবে দৈনিক পত্রিকায় মাঝে মধ্যে বিদেশী দু-এক-টি ক্ষতিকর উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ হতে দেখা যায়। মাঝে মধ্যে কোনো কোনো চ্যানেলেও এ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। বাংলাদেশে বিদেশি প্রজাতিগুলো ক্ষতিকর কি না তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা রকম আলোচনা আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিকভাবে হতে দেখা যায়। তবে অধিকাংশ সময় এসব বিতর্ক বাংলাদেশে পরিচালিত গবেষণা ফলাফল নির্ভর না হয়ে তা অনুমান নির্ভর হয়ে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি এক ধরনের দ্বন্ধ তৈরি করেছে। সত্যি কথা বলতে কী বাংলাদেশে আগ্রাসী পরক প্রজাতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। অথচ জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিষয়টি খুবই জরুরি। জাতিসংঘের CBD (কনভেনশন অন বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি)-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরে আগ্রাসী পরক প্রজাতির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ বা ধ্বংস করার জন্য সম্মতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত 'NBSAP (ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটিজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান) ২০১৬ - ২০২১' প্রতিবেদনের অনেক জায়গায় আগ্রাসী পরক প্রজাতি দেশের জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে মোট ১৫টি উদ্ভিদ (কচুরি পানা, আসাম পাতা/শিয়ালমুটি, আসাম লতা, বন তুলসি, রাইমুনিয়া/ল্যান্টেনা, উচুণ্টি, বনকলাই, জটাকাঞ্চুরা, হিরণপগ, ভূঁইওকরা, বিলাতি তুলসী/ তোকমা, ঢোলকলমি, কেশরধাম, লজ্জাবতী, গাজর ঘাস/পার্থেনিয়াম)-কে আগ্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডভিত্তিক ইনভেসিভ স্পিসিস স্পেশালিস্ট গ্রুপ (স্পিসিস সারভাইভাল কমিশন আইইউসিএন) বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন ১৩৮টি পরক প্রজাতির খসড়া তালিকা করেছে। এর মধ্যে ১০৮টি উদ্ভিদ এবং বাকি ৩০টি প্রাণী প্রজাতি। এই তালিকায় আগ্রাসী হিসাবে ৩৪টি উদ্ভিদের নাম (সারণী -১) মোটামুটিভাবে নিশ্চিত করা হলেও বাকি ৭৪টি উদ্ভিদ প্রজাতি চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত/যাচাই করা হয় নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্পিসিস সারভাইভাল কমিশনে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তারা বাংলাদেশে আগ্রাসী পরক প্রজাতির যাচাইকৃত সমগ্র তালিকা প্রকাশ করতে পারছে না।

স্পিসিস সারভাইভাল কমিশন ২০০০ সালে পৃথিবীর সব থেকে খারাপ ১০০টি আগ্রাসী পরক প্রজাতির তালিকা প্রকাশ করে। তার মধ্যে বাংলাদেশে পাওয়া যায় ৭টি উদ্ভিদ প্রজাতি। উদ্ভিদগুলোর বাংলা নাম : কচুরিপানা, আসাম পাতা/শিয়ালমুটি, রাইমুনিয়া/ল্যান্টেনা, তারা লতা, উলু, জারমান লতা ও নল। এর মধ্যে একমাত্র 'নল'

ছাড়া বাকি ৬টি প্রজাতিই ইনভেসিভ স্পিসিস স্পেশালিস্ট গ্রুপ কর্তৃক বাংলাদেশের ৩৪টি আগ্রাসী পরক প্রজাতি তালিকায় স্থান পেয়েছে (সারণী -১)।

বাংলাদেশে উদ্ভিদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের উপর উন্নতমানের নির্ভরযোগ্য গবেষণা খুবই কম হয়েছে। কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধে বাংলাদেশে আগ্রাসী পরক প্রজাতির তালিকা প্রকাশিত হলেও- তালিকাভুক্ত প্রজাতিগুলোকে আগ্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড সবগুলোতে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় নি। ফলে, এসব প্রবন্ধে তালিকাভুক্ত প্রজাতিগুলোর আগ্রাসী চরিত্র নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে আগ্রাসী পরক প্রজাতির বৈচিত্র্য, প্রকৃতি, প্রাচুর্য, ক্ষতির ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশি ক্ষতিকর উদ্ভিদ প্রজাতির অনুপ্রবেশ, তাদের চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা শুরু করা প্রয়োজন। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ বিষয়ে পৃথক একটি সেল করা যেতে পারে। পৃথিবীর বহু দেশে আগ্রাসী পরক প্রজাতির উপর গবেষণার জন্য পৃথক সেল রয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিষয়টি জরুরি। অতীতে সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিবেদনে আগ্রাসী বিদেশি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সম্পর্কে সতর্ক-বার্তা উচ্চারিত হলেও এ সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো গবেষণা দেশে হয় নি। এ গবেষণা দ্রুত শুরু করা গেলে দেশের জীববৈচিত্র্য তথা বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষার জন্য তা মঙ্গলজনক হবে। সেই সাথে নতুন কোনো বিদেশি উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী দেশে আনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। নতুন বিদেশি কোনো উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী প্রজাতি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার আগে তার উপর কয়েক বছর নিবিড়ভাবে গবেষণার দ্বারা বাস্তুতন্ত্রে তার সম্ভাব্য অভিঘাত জানা ও সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

সারণী ১. বাংলাদেশের আগ্রাসী পরক প্রজাতির তালিকা (উৎস: Invasive Species Specialist Group 2018. Global Register of Introduced and Invasive Species GRIIS, Bangladesh Checklist ver 2017)।

	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম	পরক	আগ্রাসী
১.	*Acanthospermum hispidum* DC	কাঁটাগোখরো	?	✓
২.	*Acrostichum aureum* L.	হুদো	✓	✓
৩.	*Ageratina altissima* (L.)	সর্পমূল	✓	✓
৪.	*Ageratum conyzoides* L.	উচুণ্টি	✓	✓
৫.	*Alternanthera ficoidea* (L.)	কুশল	✓	✓
৬.	*Caesalpinia pulcherrima* (L.)	রাধাচূড়া	✓	✓
৭.	*Cajanus scarabaeoides* (L.)	কুমশিম	✓	✓
৮.	*Cestrum diurnum* L.	দিবা জুঁই	✓	✓
৯.	**Chromolaena odorata* (L.)	আসাম পাতা/শিয়ালমুটি	✓	✓
১০.	*Commelina obliqua* Vahl.	জটাকাঞ্চুরা	✓	✓
১১.	*Convolvulus arvensis* L.	হিরণপগ	✓	✓
১২.	*Croton bonplandianus* Baill.	বন তুলসি	✓	✓
১৩.	*Cryptocoryne ciliata* (Roxb.)	কেরালি	?	✓
১৪.	*Derris trifoliata* Lour	কালিয়া লতা/পান লতা	✓	✓
১৫.	**Eichhornia crassipes* (Mart.)	কচুরি পানা	✓	✓
১৬.	*Entada rheedii* Spreng	গিলা	?	✓
১৭.	*Elaeis guineensis* Jacq.	পাম ওয়েল	✓	✓
১৮.	*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.	ইউক্যালিপটাস	✓	✓

১৯.	**Imperata cylindrica* (L.)	উলু	✓	✓
২০.	*Ipomoea aquatica* Forssk.	কলমি শাক	✓	✓
২১.	*Ipomoea carnea* Jacq.	ঢোল কলমি	✓	✓
২২.	**Lantana camara* L.	রাইমুনিয়া/ল্যান্টেনা	✓	✓
২৩.	*Limnocharis flava* (L.)	লেটুস পানা	✓	✓
২৪.	*Ludwigia adscendens* (L.)	কেশরদাম	✓	✓
২৫.	*Mikania cordata* (L.)	আসাম লতা	✓	✓
২৬.	**Mikania micrantha* Kunth	তারা লতা	✓	✓
২৭.	*Mikania scandens* (L.)	জারমান লতা	✓	✓
২৮.	*Mimosa pudica* L.	লজ্জাবতী	✓	✓
২৯.	*Parthenium hysterophorus* L.	গাজর ঘাস/পার্থেনিয়াম	✓	✓
৩০.	*Paspalum distichum* L.	গিটা ঘাস	✓	✓
৩১.	*Senna occidentalis* (L.)	বনচাকুন্দা	✓	✓
৩২.	*Shirakiopsis indica* (Wild.)	হুরমুই	?	✓
৩৩.	*Syzygium fruticosum* DC	সাবরি	?	✓
৩৪.	*Tamarix indica* Willd.	ঝাউ	?	✓

*পৃথিবীর সব থেকে খারাপ ১০০টি আগ্রাসী পরক প্রজাতির তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশের আগ্রাসী পরক প্রজাতি।

চিত্র ১: পৃথিবীর সব থেকে খারাপ ১০০টি আগ্রাসী পরক প্রজাতির তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশের ৫টি আগ্রাসী পরক প্রজাতির ছবি (উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া)।

আমাদের তরুলতা

ড. সানজিদা মুবাশ্‌শারা
অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মালতী, মাধবী, মাধুরী, মল্লিকা- সকলই আমাদের পুষ্প তরু। কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যে ভরা এ সকল লতার নামে বাঙ্গালী মেয়েদের নাম রাখা হয়। তাছাড়া গানের কলি কিংবা কবিতার পঙতিতে ধরা দেয় এদের রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, বৈচিত্র্য।

যেমন-"ঐ মালতী লতা দোলে
পিয়াল তরুর কোলে পূব হাওয়াতে"
অথবা-" মাধবী হঠাৎ কোথা থেকে এল ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে, যাই যাই যাই "
বা "এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমার হৃদয় উপবনে
কিংবা "আমার মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি
নতুবা " সন্ধ্যাবেলার চামেলী গো
সকাল বেলার মল্লিকা আমায় চেন কি?

এদের মধ্যে মাধবী ও মাধুরীকে নিয়ে আমাদের মনে খটকা আছে। আসলে মাধুরী আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত মধু মঞ্জুরী ছোটকালে যার ফুলের লম্বা বোটা চুষে মধু গ্রহণের অভিজ্ঞতা কম বেশি সকলের আছে। সাদা-লাল-কমলার মিশ্রণে থোকায় থোকায় ফুটে থাকা আকর্ষণীয় ফুলটিকে অভিজাত বাড়ী, শিক্ষাঙ্গনে ও বাগানের ফটকে দেখা যায়। মৃদু সুগন্ধিযুক্ত ফুলটি কম বেশি সারা বৎসর ফোটে যার বৈজ্ঞানিক নাম *Quisqualis indica* এবং এটি Combretaceae গোত্রভূক্ত। আর মাধবী সচরাচর চোখে পড়েনা তবে দেখতে চমৎকার আর মন মাতানো গন্ধে ভরা। সাদা বর্ণের ফুলটির স্থায়ীত্বকাল অল্প। পাঁচ পাপড়ীর ফুলটির পঞ্চম পাপড়িটির গোড়া হলদে বর্ণের তিল ফুলের মত যাতে প্রচুর ভ্রমর আনা গোনা করে। এটি Malpighiaceae গোত্রভূক্ত লতা যার বৈজ্ঞানিক নাম *Hiptage benghalensis*। মালতীকে মধু মালতী ডাকা হয় যার দ্বিপদী নাম *Aganosma caryophyllata*। Acanthaceae গোত্রভূক্ত এ পুষ্প সাদা তিল বীজের সাথে পিষে সুগন্ধি তেল তৈরি করা হয়। দন্ডের আগায় গোলাকার দুধ সাদা বর্ণের পাচ পাপড়ির ফুলটি চৈত্র বৈশাখ থেকে শরৎকাল পর্যন্ত মিষ্টি গন্ধে ভরিয়ে রাখে আমাদের চারপাশ যার লাবণ্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ কবি লিখেছেন- "উতলা হয়েছে মালতীর লতা, ফুরালো না তার মনের কথা" ।

এছাড়া মল্লিকা, যুথিকা বা জুই, চামেলী, বেলী এরা সকলেই Oleaceae পরিবারভূক্ত Jasminum গনের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির সুগন্ধি পুষ্প অর্থাৎ পরস্পর নিকটাত্নীয়। এদের সাদা রং এবং মিষ্টি সৌরভ মনকে স্নিগ্ধ ও সতেজ করে রাখে। অনেকেই মল্লিকাকে বেলি ফুলের আরেক নাম মনে করে আসলে মল্লিকা লতা ধরনের গাছ ইংরেজিতে অ্যারাবিয়ান জেসমিন নামে পরিচিত। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Jasminum sambac*। তারকাকৃতির সাদা রঙের ফুলটির মন মাতানো গন্ধ কবির ভাষায়-

"সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারই কুঞ্জে উঠে জাগি
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার কর পদ্ম দলের লাগি"

মালা গাথাঁর জন্য এই জুই বা যুথির প্রচুর চাহিদা। উৎসবে আমেজে মেয়েদের খোপা বা গলায় শোভা পায় এ

সকল মালা। গানের কথায়-"কাজল নয়নে যুথি মালা গলে" অথবা "শ্রান্ত ভালে যুথির মালে পরশে মৃদু রায়" বা "সন্ধ্যাযুথীর গন্ধভারে পান্থ যখন আসবে দ্বারে" ইত্যাদি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Jasminum ariculata*, এর গন্ধ বেলি ফুলের মতই, কয়েকটি ফুল এক জায়গায় ফোটে এবং কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়- "আমি সকল কুঞ্জ কানন ঘিরে এনেছি যুথী জাঁতি"- আর এই জাঁতি হল স্মিতশুভ্রমুখী আমাদের চামেলী, শুকিয়ে গেলেও অনেক দিন পর্যন্ত যার গন্ধ থাকে। সাদা বর্ণের ফুলটি আকৃতিতে তুলনামূলক বড় আর গন্ধ অনেকটা জুই ফুলের মতই। এর বেজ্ঞানিক নাম *Jasminum grandiflosum*।

বর্ষার দুটি মন জুড়ানো মৌসুমী ফুল অপরাজিতা ও ঝুমকো ফুল। গাঢ় বর্ণের, হালকা সুবাসিত ও বেশ আকর্ষণীয় ফুল দুটিকে এখন দেশীয় ফুল হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। অপরাজিতা কখনও যার পরাজয় নেই। এই কথা কালিদাসের শকুন্তলায় পাওয়া যায় অর্থাৎ এটি প্রাচীন ফুল যার নীল রং এবং কাব্যিক নাম আমাদের শিল্প মানসে দোলা দেয়। নীল ছাড়া সাদা ও বেগুনি রঙের অপরাজিতা চোখে পড়ে তবে নীল অপরাজিতা সারা বছর কম বেশী ফোটে। ফুলটি সীম ফুল সদৃশ তবে কিছু প্রজাতি প্রজাপতির মত তাই এর ইংরেজি নাম বাটার ফ্লাই পি। উদ্ভিতাত্তিক নাম *Clitoria ternatea*। Papilinaceae পরিবারভুক্ত, লতা ঝোপময়, চিরসবুজ গাছটি বাশের বেড়া, রেলিং অথবা ছাদের কার্নিশ অবলম্বন করে বেড়ে উঠে। রূপ ছাড়াও এর লতা-পাতা, শেকড়-বাকড় রোগ ব্যাধি নিরাময়ক। আর ঝুমকো ফুল ঝুমকো লতা নামে বেশী পরিচিত যার ঝুলন্ত ফুলের আকৃতিতে মেয়েদের কানের এক ধরনের গহনা ঝুমকো নামে পরিচিতি পেয়েছে। ফুলটি দেখতে গোলাকার ঘড়ির মত, পাপড়ি গুলো সমান্তরালে ছড়িয়ে শোভা বর্ধন করে । নীল রঙের ফুলই বেশী দেখা যায় তবে কোন কোন জাতের ফুল ছোট সাদা, ঘন নীল ও হলুদ রঙের হয়। জংলী জাতটির ফল বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো দস্যি ছেলেমেয়েদের কাছে বেশ লোভনীয়। বেরি জাতীয় ফলটির ভেতর অনেকগুলি মাংসল কোষ থাকে ছোট কালে আমরা বলতাম বিড়ালের নলী। বর্তমানে শোভা বর্ধক হিসেবে রক্ত লাল বর্ণের একটি জাত অভিজাত বাগানে স্থান করে নিয়েছে। ফুলটির ইংরেজি নাম *Passion flower*, উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Passiflora caerulea* এবং এটি passifloraceae গোত্রভূক্ত লতা যাকে দেখা গেছে রবীন্দ্র কাব্যে -

"কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়
ঝুমকো লতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চমকে চাওয়ায়"।

আর নজরুল গেয়েছেন- "ঝুমকো লতার চিকন পাতায় দেখেছি তোমায় লাবণী প্রিয়া"।

এছাড়া গেইট ফুল নামে গাঢ় মেজেন্টা রঙের ফানেল আকৃতির যুক্ত পাপড়ির একটি ফুল আমাদের শৈশব স্মৃতিতে রয়ে গেছে যার পোশাকী নাম কুঞ্জলতা, উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Ipomea quamoclit*। Convolvulaceae পরিবারভূক্ত গুল্ম লতাটি চিরুনী সদৃশ পাতা আর হালকা নরম কান্ড নিয়ে বেড়া বা গেইট অবলম্বন করে যত্রতত্র বেড়ে উঠে। ইংরেজিতে একে বলে star glory, ভোরের আলোয় যা পাপড়ি মেলে আর দুপুরের আগেই বন্ধ করে ফেলে। আর অনন্ত বিস্তৃত অনন্তলতা, প্রতিকূল পরিবেশেও বছরের পর বছর ভূনিম্নস্থ কন্দ ও চোষক মূলের সাহায্যে বহাল তবিয়তে টিকে থাকে যা রোমান্টিক মনে লাভ চেইন বা লাভ ভেইন নামে আদৃত। ফুলটি সরু বৃন্তযুক্ত এবং মঞ্জুরী দন্ড সংযুক্ত যার অগ্রভাগ একাধিক আকর্ষে পরিবর্তিত হয়। এক সময়ের আগাছা অনন্তলতার ঝাড় এখন কিন্তু সৌখিন বাগান ছাড়া যত্র তত্র দেখা মেলেনা। এর রূপসী ফলগুলি লুকিয়ে থাকে ফুলের পাপড়ি সদৃশ বৃতির নীচে। Polygonaceae গোত্রভূক্ত *Antigonon leptopus* দ্বিপদী নামের লতাটির লাল, সাদা ও গোলাপী জাতের দেখা মেলে বর্তমানে। এছাড়া বাসর লতা নামের লম্বা পুষ্প মঞ্জুরীর ঝোপময় শক্ত কান্ডের লতা গুল্মটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় *Thunbergia mysoresis* হিসেবে। লম্বা মঞ্জুরী দন্ডে মেটে লাল বৃতি আবৃত রাশি রাশি পেন্ডুলাম আকৃতির ফুল ক্রমন্বয়ে ফোটে এবং মঞ্জুরী দন্ডটি অনেক নীচ পর্যন্ত ঝুলে পড়ে যার আদলে বাসর সাজানো হয়। লতাটি Acanthaceae পরিবারভূক্ত গাঢ় চকচককে সবুজ আচ্ছাদন সদৃশ।

এছাড়া বসন্তের দুটি নজর কাড়া লতা হল নীলমনি লতা ও কনকলতা বা অগ্নিশিখা। কনক লতাটি গোল্ডেন শাওয়ার নামে বেশী পরিচিত। এর বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় গাঢ় কমলা বর্ণের অবনতমুখী ফুলের সৌন্দর্য অতুলনীয়। পুষ্পবৃন্তগুলি অসমান হওয়ায় ফুল গুলি প্রায় একই তলে অবস্থান কওে জলপ্রপাতের ধারার মত দৃশ্যমান হয়। Bignoniaceae গোত্রভূক্ত এ লতাটির বৈজ্ঞানিক নাম *Bignonia venusta*। একই সময়ে নীলমনি লতা তার সারা অঙ্গে নীল শাড়ী জড়িয়ে বসন্ত বাতাসে নেচে বেড়ায়। এর স্থায়ীত্বকাল খুব কম তবে ঝরা ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ্য। দুই স্তর বিশিষ্ট পাচঁ পাপড়ির ছোট ছোট অনেক গুলো ফুল লম্বা পুষ্পদন্ডের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সজ্জিত থাকে। বৃতি গাঢ় নীল রঙের এবং ফুল ফোটার পর পাতাও নীলাভ বর্ণ ধারণ করে বলে একে নীলবসনা বলা হয়। Verbenaceae গোত্রভূক্ত লতাটির উদ্ভিতাত্ত্বিক নাম *Petrea volubilis*। আর নীলমনিলতা নামটি আদর করে দিয়েছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। তিনি লিখেছেন-

"নীলিমা বন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা
তারি ধারা পুষ্প পাত্রে ভরি নিল নীলমনিলতা"।

আরও আছে তীব্র গন্ধ যুক্ত কাঁঠালী চাঁপা যার সবুজাভ বর্ণের ফুল রাতের বাতাসে পাকা কাঠালের সুঘ্রান ছড়ায়। ধীরে ধীরে ফুলটি পরিণত হয়ে সোনালী বর্ণ ধারন করে। Anonacae গোত্রের গাঢ় সবুজ বর্ণের গাছ প্রথমে শক্ত ঝোপালো হয়ে বেড়ে উঠে পরে লতানো শুরু করে। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Artabotrys hexapetalus*। তীব্র রসুনের গন্ধযুক্ত আরও একটি লতার সাথে সম্প্রতি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে পরিচয় হয়েছে যাকে রসুন লতা বলা যায়। Bignoniaceae গোত্রভূক্ত উদ্ভিদটির বৈজ্ঞানিক নাম *Mansoa alliacea*। সবশেষে বাগান জুড়ে রুপের পরসা সাজিয়ে বাগান বিলাস বাগানের শোভা বাড়ায় যা বোগেন ভেলিযা নামেও সমধিক পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম *Bougainvillea spectabilis*। Bignoniaceae গোত্রের কাষ্ঠল লতাটি প্রজাতি ভেদে লাল, সাদা, বেগুনি, হলদে ও নীলাভ রঙের মঞ্জুরীপত্র পুষ্প-প্রতিম সৌন্দর্য্য নিয়ে ক্ষুদ্র টিপ বোতামাকৃতির ফুলগুলিকে আগলে রাখে সযতনে। আরও আছে স্বর্ণলতা *(Cascuta reflexa)* বা আকাশবল্লী যার সৌন্দর্য ফুলে নয় তার শায়িত শাখায় এবং শক্ত ঝুরীর গুলঞ্চ লতা *(Tinospora cordifolia)* বা অমৃতবল্লী যা খেয়ে দেব দেবীরা যৌবন অক্ষুন্ন রাখেন। এদের গোত্র যথাক্রমে Cuscutaceae ও Minispermalcae।

সর্বোপরি এই সকল তরুলতা হেজ হিসাবে, ল্যান্ডস্কেপিংয়ের কাজে, রুপ সজ্জায় উপকরনে, পুষ্পপ্রেমিদের মনের প্রশান্তিতে এবং রূগ্ন দেহে রোগ নিরাময়ে আশির্বাদ স্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিরাজমান। তাছাড়া মাধবীতলা, মালতীলতা, মল্লিকাবন, কুঞ্জবিথী, চামেলী কানন, জুঁই শাখা, যুথীর মালা, অপরাজিতার রং ইত্যাদির সাবলীল উপস্থিতি মেলে আমাদের কাব্য সাহিত্যের প্রেম উপাখ্যানে। তাই এ সকল তরুলতার প্রতি আমাদের যত্নশীল হতে হবে এবং দায়িত্ব নিয়ে এদের সম্প্রসারণে এগিয়ে আসতে হবে।

Knowing Barriers to Roof Gardening in Dhaka City as a Policy Paper

Md. Aminul Islam
Sociologist, Social Forest Wing, Ban Bhaban

Abstract
Dhaka the capital city of Bangladesh, being more populous area among world. About one eighth portion of total population of Bangladesh lives only in Dhaka city and the rest of the population lives within 64 districts! Gradually the city is losing its green coverage and turning as bricks-concrete town. Though rooftop garden plays an important role in the city life for green life. In spite of having hundred benefits, a lot of roofs are bare, But why? The study was carried out in various places like Monipur, Kazipara, Shewrapara, Taltola, Ibrahimpur, Kollyanpur, Uttara, Jatrabari, Khilgaon, places about 25 householders interviewed randomly. I tried to explore the hidden barriers to roof gardening activities. There lies common believes among stakeholders such as if they do roof garden, roof may be damped, have no knowledge or training on roof gardening, not available soil for gardening, seeds, fertilizers, pesticides; absence of nearby training center, sometimes happened scarcity of water supply for few days, sometime whole family members enjoyed tour programs at a long time for that reasons they cannot raise garden in spite of having strong will. They strongly feel the absence of local or nearby home trainings and cheap services.The study period was in December ,2018.

Introduction
Dhaka gradually losing her green coverage day by day. But The Government of Bangladesh does not have any specific policy provision or legislation that promotes urban agriculture in general or rooftop garden in particular. There is no specific city policy that promotes roof gardening in city areas.

Description of the problem
The household survey reveals some barrier to rooftop garden. Some are highly interested to practice gardening but have no practical knowledge. When pest attacks on plants, they have nothing to do. Sometimes the practices wrong use of pesticides. Sometimes plants do not bear fruits or cannot keep them to matured. Some HHs members go outside for a week or more. So the plants cannot survive. Sometimes happened severe scarcity of water supply, as a result, plant cannot survive.

Objectives of the study

The main objective of the study had to explore the hidden causes or barriers to roof gardening and way finding for solve the barriers. In this context Dhaka is losing her green coverage every year that hampers our lives, livelihood, environment. So there is no alternative without roof gardening.

Methodology

This study aims were to carried out conducting both quantitative and qualitative survey which will includes Households, Teachers, Government Officials, Social worker, Local leaders, Local motivator etc as target population. The target respondents were selected randomly from some places based on current information on roof gardening barriers. A total number of 25 respondents interviewed through questionnaire. Besides, in-depth interview of 25 respondents was taken from various location of that community like Monipur, Kazipara, Shewrapara, Taltola, Ibrahimpur, Kollyanpur, Uttara, Jatrabari, Khilgaon places in Dhaka, preferably those who are in a presence or available basis. Well-structured questionnaires were developed after an intensive review of the literature and practical experience for interviewing. Another semi-structured questionnaire was applied to undertake the in-depth interview.

Literature review

To understand some barriers, I had to study some existing policies like: National agricultural Policy-2018; National House Building Policy, NBR Taxation criteria, City Corporation activities, National Award by PM for Tree Plantation activities etc. which provide me the strength, weakness, opportunity and threats understanding relating my proposal.

Findings and discussions

Some major constraint has found from interview, survey and relevant literature, like

- Many of the city residents have no training on rooftop gardening. Without sufficient training may lead frustration and reluctance.
- Some HHs are old and have phobia for dampness as well as earthquake.
- Sometimes happen shortage of water supply during dry season.
- There is no organized efforts from Government, community or NGO.
- Sometimes private organizations service charge is very much higher.

Summary of Expert Opinion on RTG

In this part of this paper I had interviewed some prominent persons about roof gardening and social capital using.

Sl No	Name of Expert with Designation/position	Opinion/comments
1	Dr. A.F.M Jamal Uddin Professor Department of Horticulture Faculty of Agriculture Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka	In 24 November, 2015, the Daily ProthomAlo printed a circular about training program on roof gardening and thousands Application submitted by people. It was out of capacity to cover all applicants. It was their personal test case about interest of roof garden training. Renowned Professor Dr. Jamal Uddin take personal initiative and utilized Social Capital for training purposes. He abled to provide training 20 batch, each batch contained 30 persons. He motivated our Great Late Mayor Mr. Anisul Haque about Green Dhaka slogan.
2	Md. Taherul Islam A.D. Department of Agricultural Extension,	Dhaka has about 12 Lacs roof spaces in 122 wards, of them about 7000 roofs have only roof garden.

Finding options to tackle the issue: As problems are identified, so the solutions to be taken as logical way.

1. Agricultural universities, Agricultural Departments and Institutions; Forest Department, City Corporations, Private Organizations may take combined or can arrange separate actions onroof gardening training program.
2. Govt. Department Can take roof gardening project.
3. Using Participatory approach and Social Capital strategy for roof gardening trainingprograms(where no needed monetary use of government, only needed expert use from Government or non-Government personnel).

Risk Analysis for the Policy Analysis on RTG :

SL	Policy Options	Risk Factors	Rank : (High/ Medium/ Low)	Necessary Actions
1	Agricultural universities, Agricultural Departments and Institutions; Forest Department City Corporations, Private Organizations may take combined or can arrange separate actions on roof gardening training program.	Budget collection, Proper management, Corruption, Technical management, Human resource, Timely decision, Coordination etc.	Medium	Transparency Follow-up Training
2	Govt. Department Can take roof gardening project.	Budget collection, Proper management, Corruption.	High	Transparency Monitoring Follow-up
3	Using Participatory approach and Social Capital strategy for roof gardening trainingprograms	Coordination Transparency.	Low	Awarding, Transparency

Draft Policy Action Plan on RTG (3 years): About 15 Lacs roof for 3 years' time scheduled planned below format.

Activities / Options	Actor	3 years duration						Required resources
		1st bi year	2nd bi year	3rd bi year	4th bi year	5th bi year	6th bi year	
Option #3	Using Participatory approach and Social Capital strategy for roof gardening training programs	2.5 Lacs	2.5 Lacs	2.5 Lacs	2.5 Lacs	2.5 Lacs	2.5 Lacs	50,000 trainee per months. Daily 30 groups and 2 separate shift of morning and eveningtraining; each batch 60 hhs, where Govt budget need not required and least cost like per HHs contribute 1000/tk. for 2 days trainings materials.

How to run the Program:

Making development plan or Problem identification	Community discussions and social mapping, Community based development plan or identification of problem solving method, Making work plan and training schedule through community consensus. Finding sponsor/ donor/ benevolent workers and awarding them by certificate for courtesy activities like honoring by banner or poster supporting or some activities.
What to be needed	Posturing or announcing the activities and instructions, Room or class room of social institutions, table-chair, light, sound box, laptop, projector and monitor, modem, printer, papers, pads, Register book etc.
Work Force	National or Local Icon/ Star/ Respected personnel, local leaders, sponsor, donor, benevolent workers, Religious leaders, Resource persons, a well speaker or motivator who can perform the ceremony through Social Capital using
Motivational technique	Recitation the national anthem, Recitation some motivational songs or video clips like: Discussion by Religious Leader about the duties and roles for parents, neighbors, relatives etc., Discussion on the importance of subject matter and training activities.
Transparency approach	All expenditure and activities to be submitted and revealed for all.

What can We do for RTG in policy level?
We can take some addition in some existing policy

- In the House Building Policy need to include mandatory adopt Green Technology like rooftop gardening area reservation on every roof, Solar energy as well as rainwater harvesting structured etc.
- National Revenue Board (NBR) can introduce 2000/tk Green Tax for the HHs of non-roof garden buildings or Tax rebate 2000/tk for Green roof garden at least having at least 100 numbers alivetubs or pots.
- City Corporation may enact a option in their policy to introduce in every ward Top Ten prizes for roof gardeners at every year by every ward commissioners

Here need to combined initiatives of Agricultural Ministry, Ministry of Environment, Forest and Climate change, Department of House Buildings, LGED, Rajdhani Unnayan Kortipakhha (RAJUK), NBR, City Corporations etc

Conclusion

Although there has been not found serious restriction on RTG and government initiatives is not prominent. Government Financial barrier cannot fulfill the RTG activities. Householders are more interested to obtain training for RTG. Here need to combined initiatives of Agricultural Ministry, Ministry of Environment, Forest and Climate change, Department of House Buildings, LGED, Rajdhani Unnayan Kartipakhha (RAJUK), NBR, City Corporations etc. to adopt in policy. ThenUsing Participatory approach and Social Capital strategy for roof gardening trainingprograms where no need of monetary use by government, only needed support of expert use from Government or Non-Government personnel as continuous process. It is our dream to see this city as a “green city”.

টেকসই উন্নয়ণে কাবর্ন হ্রাসের ভূমিকা

ড. মোহাম্মদ একরামূল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান, সি এম আর আই টি

জীবজগতের টিকে থাকার পূর্বশর্তই হলো শক্তির যোগান। কাবর্ন ও নাইট্রোজেন চক্র আমাদের শক্তির যোগান দেয় সূর্য ও নক্ষত্র পুঞ্জ থেকে। সেই শক্তিই আমাদের সচল রাখে। ১৬৪০ সালে ভ্যান হেলমন্ট (১৫৮০-১৬৪৪) কাঠ কয়লা কার্বন- ডাইঅক্সাইড আবিস্কার করেন। পোড়ানোর সময় কিন্তু কার্বনের নামকরণ করেন বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ ল্যাভোসিয়ে (১৭৪৩-১৭৯৪)। ১৭৮৯ সালে কাবর্ন শব্দটি তিনি নেন গ্রীকশব্দ চারকল (Charcoal) থেকে যার আভিধানিক অর্থ কাঠকয়লা।

উন্নয়ন বলতে কোন কিছুর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বুঝায় যা বর্তমান অবস্থান থেকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রধানে সৃষ্ঠি সহায়ক। যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার ভার উন্নয়ন বলতে আমরা এখন বাস, জাহাজ ও এরোপ্লেনে বুঝি যাতায়াত বুঝি পুরাতন বাহন যেমন গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী কিংবা পালতোলা নৌকা এখন বিলুপ্ত প্রায়। উন্নয়ণের ধারাবাহিকতায় উপভোগ্য জিনিস বুঝাতে প্যাকেটজাত দ্রব্য থেকে শুরু করে রেফ্রিজারেটর, ভ্রমণ ইত্যাদি অন্তভুক্ত। এসকল উন্নয়ন বিনা ক্ষতিসাধনে হয়নি। Consumers পন্য তৈরীতে জ্বালানী প্রযোজন। এ জ্বালানীর বেশীর ভাগই জীবাশ্ম জ্বালানীর অন্তর্ভুক্ত। জীবাশ্ম জ্বালানী বাতাসকে দূষিত করে যা বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত বিপদজনক বার্তা। আমরা জানি আমাদের ব্যবহার্য সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অসীম। এই অসীম চাহিদা পুরণ করতে যেয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি। হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে আমরা নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে যেয়ে বুঝে না বুঝে পরিবেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করছি। ১৭৭৯ সালে থমাস রবার্ট ম্যলথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) লিখেন-

“Famine seems to be the last the most dreadful resource of nature. The power of population is so superior to the power of the earth to produce subsistence for man, that premature death must in some shape or other visit the human race” থমাস ম্যালহাসের যুক্তিকে জোড়ালো করেন যুক্তরাষ্টের এরলিচ (Ehrlich) দম্পত্তি তাদের সাড়া জাগানো বই “The Population Boam”-এ। পরিবেশ বির্পযয়ে তারা মানুষকেই দায়ী করেছেন। এর বিপক্ষের মতবাদ হলো মানুষ নয়; মানুষের প্রতি মানুষের সম্পদের অসম বন্টনই মানুষের বিপর্যয়ের মূল কারণ এক্ষেত্রে ইটালিয়ান অর্থনীতিবিদ ভেলফ্রোডা প্যারেটোর (১৮৪৮-১৯২৩) বিখ্যাত ৮০-২০ নিয়মটি সর্বজন স্বীকৃত। এরলিচ দম্পত্তি পরবর্তীতি নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে আইপ্যাট (IPAT) মডেল- এর অবতারণা করেন। IPAT মডেল ধারা পরিবেশের উপর মানুষের কর্মকান্ডের ও এর পরিমাণকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরিবেশ দূষণের মোট পরিমান। ‘P’ উল্লেখিত জাতি বা গোষ্ঠির মোট জনসংখ্যা; ‘A’ হলো উপভোগ্য পন্যের পরিমান আর ‘T’ হলো প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে পরিবেশ দূষণের মাত্রা, তাই I = PAT মডেলকে নিম্নরূপে লিখা হয়।

দূষণ = (জনসংখ্যা) x (জনসংখ্যা কর্তৃক উপভোগ্য পণ্যের পরিমান) x (প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশের ক্ষতির পরিমান)

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই সকল মৌলিক চাহিদা পূরণে আমরা নানাবিধ পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরন ব্যবহার করে থাকি। শিল্পবিপ্লবের বড় কারণের মধ্যে একটি ছিল এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোকে যথাযথা পুরণ করার চেষ্ঠা করা। যাতে মানুষ আরামপদ জীবন যাপন করতে পারে। অচিরেই এই বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে

প্রযুক্তির ব্যবহার। শিল্প বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল পেশী শক্তির পরিবর্তে মেশিন শক্তির ব্যবহারকে নিশ্চিত করা। আর এই সকল মেশিন পরিচালনায় প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিপুল পরিমাণ শক্তির। প্রথম দিকের যে সকল

জ্বালানী ব্যাহৃত হত, তার প্রায় সকলগুলোতেই আছে কার্বনের সবল উপস্থিতি। ২০১৫ সালের এক জরিপে কাবর্ন নি:সরণের উপর ভিত্তি করে গবেষকরা কয়েকটি খাতকে চিহ্নিত করেছেন।

কার্বন কেন ক্ষতিকর ?

উন্নয়নের নামে মানুষ কর্তৃক প্রতি বছর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নি:সরণের পরিমান প্রায় ২৯ বিলিয়ন টন, যেখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কারণ কার্বন নি:সরণ হয় মাত্র ০.২-০.৩ বিলিয়ন টন। বর্তমান নির্গত কার্বন-ডাইঅক্সইডের ৫০% ভাগই আমাদের বায়ুমন্ডলে থেকে যায় এবং তা উদ্ভিদবাজি কিংবা সমুদ্রের বিশাল জলারাশি শোষণ করতে পারছে না। যার ফলে বৈশ্বয়িক তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুইডিস বিজ্ঞানী সিভান্তে আরহেনিয়াস (১৮৫৯-১৯২৭) সর্বপ্রথম ১৮৯৬ সালে বৈজ্ঞানিক ধারণা দেন যে, জীবাশ্ম জ্বালানীর ফলে বৈশ্বয়িক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি ধারণা দেন যে, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ কর্তৃক শোষিত Infrared কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ধারণাকে বলা হয় প্রাকৃতিক গ্রীন হাউস এফেক্ট। আরহেনিয়াসের মতে কার্বন-ডাই-অক্সইডের পরিমাণ কোন কারণে দ্বিগুন হলে ভূ-পৃষ্টের তাপমাত্রা প্রায় ৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭০ মিলিয়ন হলেও বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নি:সরণে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.১৪% এবং তা মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়ণ-ও জ্বালানীর ব্যবহারের কারনে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিষাক্ত এবং তা মানুষসহ অন্যন্য প্রাণীর জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর। কোন কক্ষে কার্বন-ডাই-অক্সাইড যদি সাধারণ মাত্রা থেকে ৫% বৃদ্ধি যায় তাহলে তা মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ঠ। বায়ূমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি পেলে ওজোন স্তরের ক্ষয়প্রাপ্তি হয়। আর এর পরিনতিতে অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌছে। এর ফলশ্রুতিতে, উচ্চরক্তচাপ, মাথাব্যাথা এমনকি মানুষের ত্বকের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

স্বাস্থকর পরিবেশ

টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানীর কোন বিকল্প নেই। সবুজ শক্তি বা জ্বালানী বলতে আমরা এমন শক্তিকে বুঝি যা উৎপাদন করা যায় প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর বিরূপ আচরন ছাড়াই। নিম্নে বেশ কয়েকটি সবুজ জ্বালানী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:-

গ্রীন উটকনোলজি বা সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি

সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারে শক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্বন কিংবা কার্বন যোগের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব। এ সি ই ই সি (American council for an energy efficieat economy) এর মতে ১৯৭০ সাল এক ডলার সমমানের পন্য তৈরিতে যে শক্তি প্রয়োজন হতো এখন প্রয়োজন হয় তার অর্ধেক শক্তির। নাসটো (nastu) ২০১৮ সালে এক বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেন। নাসটোর মতে, স্টীল তৈরী কারখানা ও কম্পিউটার প্রযুক্তিতে শক্তির যথাযথা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৬.৭ ও ২.৮ মিলিয়ন।

পরিবহন ব্যবস্থায় সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার

দেশের উন্নয়ন, পারস্পরিক সংযোগ ও অর্থনীতির উন্নয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কোন দেশ কত উন্নত আর অধিকাংশই নির্ভর করে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। সবুজ যোগাযোগে ব্যবস্থার উপাদান প্রধানত দুইটি; এক যোগাযোগের জন্য এমন যান ব্যবহার করা যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করবে না। দুই: যান চালিত করার জন্য যে শক্তি ব্যবহৃত হবে তা হবে পরিবেশ বান্ধব। যেমন সৌরশক্তি কিংবা সি এন জি ইত্যাদি।

বোমা মেথড নিষিদ্ধ করা

পাথর উত্তোলনের কাজে বোমার প্রচলন বহু পূর্ব হতেই। ডিনামাইটের সাহায্য পাথর উত্তোলন কালে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আদি পরিবেশের ধংসপ্রাপ্ত হয় এবং এ পরিবেশকে কোন ভাবেই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। ফলে এক অপূনীয় ক্ষতিসাধিত হয় (উদ্ভিদ ও জীবের বাসস্থান পুরোপুরিই ধংস প্রাপ্ত হয়)। সিলেটের জাফলং অঞ্চল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পি.পি.পি- এর প্রয়োগ

পি পি পি এর মানে হলো পলোটারস প্রেন্সিপাল। এই ধারনা মতে, যারা পরিবেশ দূষন করবে, পরিবেশ দূষনমুক্ত করার সকল ব্যয়ভার এরাই বহন করবে। সাধারন জনগন নয়। আর এ ধারণার পূর্বশর্ত হলো, জনসচেতনা সৃষ্টি করা।

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করা

কীটনাশকে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে পরিবেশবান্ধব দক্ষ প্রক্রিয়ায় কীটনাশক পদ্ধতির বহুল ব্যবহারের প্রচলন করতে হবে। এসব পদ্ধতির মধ্যে জি এস এফএ (গ্র্যোনুলার সিস্টেম অফ ফার্টিলাইজার এ্যাপ্লিক্যশন) আই পি এন এম (ইন্টিগ্রেটেড প্লান্ট নিউট্রিশন ম্যানেজম্যান্ট), আই পি এস (ইন্টিগ্রেটেড পেষ্ট ম্যানেজম্যান্ট) ও রাসায়নিক কৃষি (অর্গানিক এগ্রিকালচার) অন্যতম।

৭- আর এর জনপ্রিয়করণ

পরিবেশ সংরক্ষনে বিশেষজ্ঞরা বেশকিছু ধারণার জন্ম দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিই ইংরেজী অক্ষরজ দিয়ে শুরু। এখানে এ রকম ৭টি ধারনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

ইটের পরিবর্তে বাংলাদেশ গৃহায়ন ইনষ্টিটিউট টেকনিক্যাল বিভিন্ন ব্লক তৈরি করেছেন যেমন- ইন্টারলকিং ব্লক্স, ব্লকস, পলিব্লকস, পাটের আশ দ্বারা তৈরী দেয়াল ইত্যাদি। এদের প্রধান সুবিধা হলো এগুলো তৈরি করতে খুবই কম সিমেন্ট ও বালির প্রয়োজন হয়। তাপ ও শব্দ নিবোধ। ক্ষয়প্রবনতা খুবই কম। এবং বায়ুদূষণ রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেহেতু এগুলো তৈরীতে জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের কালচারাল ক্লাবের উদ্যোগে নারায়নগঞ্জের জিন্দা পার্কে গিয়ে দেখলাম ওখানে বিভিন্ন ওয়াল তৈরীতে উল্লেখিত ব্লক্স ব্যবহৃত হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নে কার্বন হ্রাস করার অন্যতম উদ্দেশ্যগুলো হলো মানুষের চাহিদাপূরন করতে যেয়ে পরিবেশের উপর যে চাপের সৃষ্টি হচ্ছে তা সহনশীল মাত্রার মধ্যে রাখা, ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশকে রক্ষা করা, পরিবেশের ওজনগত মাত্রা রক্ষা করা, পরিবেশ ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণ করা ইত্যাদি। এ কথা সত্য যে, আমরা যে পরিমান কার্বন বায়ুমন্ডলে ইতিমধ্যে নি:সরণ করে ফেলেছি তা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি বায়ুমন্ডলে কার্বন ও কার্বন যৌগের ভয়াবহ প্রভাব বুঝতে পারি এবং জনসচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ জনগনকে বুঝাতে, সক্ষম হই। তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের লাগাম আমরা কিছুটা হলে টেনে ধরতে পারবো।

জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশের নদ-নদী

ফারুকুর রহমান
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাট

প্রায় ৪০০০ হাজার নদ-নদী-উপনদী-শাখানদীর সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম নদীব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এই দেশে। কিন্তু বিগত কয়েক শতকে তিন সহস্রাধিক নদ-নদী বিলীন হয়ে গেছে। বিশশতকের শেষদিকে এসেও ৭০০ নদ-নদী ধুঁকতে-ধুঁকতে তাদের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি. মি.। বর্তমানে আমাদের নদী ব্যবস্থার অবস্থান পৃথিবীর বৃহত্তম আমাজান নদীব্যবস্থার পরই। তবে এই নদীমালার সবগুলো শুকনো মৌসুমে প্রবাহ ধরে রাখতে পারে না। বুকে পলি জমে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে অনেক নদী। সুযোগ বুঝে ভূমিদস্যুরাও দখল করে নিচ্ছে নদীর নিজস্বভূমি। এসব নদ-নদীর, ছোট-বড় মিলে, ১২৬টির উৎস উজানের দেশগুলোতে। এক সময়ে আরো ছড়া-উপনদী-শাখা-প্রশাখা উজান থেকে বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করত। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বড় ব্রহ্মপুত্র নদ (২,৮৫০ কি.মি.) ও গঙ্গা নদী (২,৫১০ কি. মি.) বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

পৃথিবীর ক্রান্তীয় এলাকায় অবস্থিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাণবৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় প্রকৃতির মিলন ঘটেছে এ দেশে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভূ-ভাগের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে নদী আর জলাশয়। এদেশের ওপর দিয়ে প্রবহমান পৃথিবীর অন্যতম স্বাদুপানির জলধারা। পৃথিবীর যাবতীয় পানির ৯৭.৩% লবণাক্ত এবং ২.৭% মাত্র মিঠাপানি। এই মিঠাপানির সবচেয়ে বড় মজুদ বাংলাদেশে। এদশে রয়েছে পলিমাটি সমৃদ্ধ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু যা বৈচিত্র্যময় প্রাণসম্ভারের জন্য আদর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে এখানে। ৬ হাজারেরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ আছে এদেশে। এর মধ্যে ৩০০ বিদেশী, ৮টি একান্ত দেশীয়। বিপন্ন হিসেবে ৯৫ প্রজাতির দারুবৃক্ষের মধ্যে ৯২টি আবৃতবীজি এবং ৩টি নগ্নবীজি। কেবল স্বাদুপানিতেই ৩০০ প্রজাতির শৈবাল রয়েছে। এছাড়া স্বল্পলোনা ও সমুদ্রে রয়েছে অজস্র ছত্রাক। বায়োফ্লাইট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫০। বাংলাদেশে জন্মে এমন ২৫০ প্রজাতির টেরিডোফাইটের মধ্যে ৩০ প্রজাতির ফার্ন। সপুষ্পক বা আবৃতবীজি উদ্ভিদ আছে প্রায় ৫ হাজার প্রজাতির। এদেশে জন্ম-নেওয়া মাত্র ৪টি নগ্নবীজি উদ্ভিদের ৩টিই বিপন্ন।

বাংলাদেশের মানুষ শত শত বছর ধ'রে ১,৩৬৪ প্রজাতির বেশি দেশী-বিদেশী উদ্ভিদ চাষ ও সংরক্ষণ ক'রে আসছে। ৮ থেকে ১০ হাজার বছরের কৃষি-সভ্যতার ধারাবাহিকতায় এদেশের চাষীদের হাতে সংরক্ষিত হয়েছে ধান, পাট, আখ, তুলা, তিষি, সরষে, শসা, শিম, কুমড়ো, আম, প্রভৃতি। বাংলাদেশের আবহাওয়া-উপযোগী আউশ-আমন-বোরোর এখনো প্রায় ৩ হাজার প্রজাতির ধান আছে। ৫০ বছর আগে এ সংখ্যা ছিল ৬ হাজারের বেশি। এদেশে আছে ৩৩টি সাধারণ ফলের প্রজাতি। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, ও বাতাবি লেবুর মোট ৪৬৩টি প্রকারভেদ বিভিন্ন বাগান ও প্রতিষ্ঠানে সনাক্ত করা হয়েছে। গৌণ ফলের জোগানদার ৫৪ প্রজাতির এবং সেগুলো প্রায় ২৯৮ প্রকারের। বাংলাদেশে রয়েছে ৫২ প্রজাতির সবজি ও বুনোফল; এবং ৫০০০ প্রজাতির সপুষ্পক যার মধ্যে ৭০০ বনবৃক্ষ। এছাড়া রয়েছে ১৭৫ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ। এখানকার জলবায়ু কীটপতঙ্গের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। পতঙ্গের মধ্যে ফড়িং ও জাবপোকাসহ অনেক প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে; শনাক্ত হয়েছে মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়েসহ বহু প্রজাতি। তবে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর তালিকা সম্পূর্ণ নয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে মাছ, উভচর সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীরা। প্রায় ১,৬০০ প্রজাতির মেরুদণ্ডীর মধ্যে মাছ ৭০৮, উভচর ২২, সরীসৃপ ১২৬, পাখি ৬২৮ প্রজাতির; বাকিরা স্তন্যপ্রায়ী। গত শতকে এক-ডজনেরও বেশি মেরুদণ্ডী প্রাণী হারিয়ে গেছে। আইইউসিএন বাঙলাদেশের রেডবুক ২০০০ অনুযায়ী দেশের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ, ৮

প্রজাতির উভচর, ৫৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪০ প্রজাতির পাখি ও ৪০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী বিপন্ন।
এই পরিসংখ্যান আরো বদলে যাবে, কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশের মধ্যে প্রধান আঘাত আসছে এর নদীব্যবস্থায়। উপকূলীয় নদীমালাও এর বাইরে নয়। নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে ক্রমাগত। ফলে সাগরের নোনাজল নদীর উজানের দিকে বয়ে নিয়ে আসছে লবণাক্ততা; ক্রমাগত হারে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে জীববৈচিত্র্যে। আবার বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি বহনের ফলে পলি জমে উঁচু হয়ে যাচ্ছে নদীর তলদেশ। ভূ-ভাগের নদীগুলো অতিরিক্ত ১৫ গুণ পানি বহন করে সাগরে নিয়ে যায়। ফলে বন্যা, ঢল প্রায় প্রতিবছরই হচ্ছে। এসব কারণে কৃষি ফসলসহ অন্যান্য উৎপাদনের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে।

ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের দীর্ঘসময়ের (কমপক্ষে ৩০ বছরের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বা Climate বলা হয়। জলবায়ু বা আবহাওয়ার উপাদান হলো– তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, বায়ুচাপ, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ইত্যাদি। ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানভেদে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জলবায়ুর তারতম্য নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

আজকাল 'জলবায়ু পরিবর্তন' কথাটি জলবায়ুর নানা পরিবর্তিত পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে নানারূপ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে জমে থাকা বরফ গলনের হার বৃদ্ধি পেয়ে একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, অন্যদিকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বন্যা। এতে স্বাভাবিক পানিচক্র ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো নদীমাতৃক দেশের নদ নদীগুলোর তলদেশ উঁচু হয়ে নাব্যতা হারাচ্ছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবন জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নেমে আসছে চরম বিপদ আর দুর্ভোগ। ক্রান্তীয় জলবায়ুর এই দেশে বর্ধিত তাপমাত্রার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। পানিচক্র, বায়ুচক্র, উদ্ভিদ ও প্রাণিচক্র প্রভৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার ও মাত্রাও হচ্ছে তীব্রতর। সাম্প্রতিক আইলা, নার্গিস, সিডর, সুনামির মতো ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির দিকে তাকালেও ভবিষ্যৎ দুর্ভোগসমূহ সহজেই অনুমান করা যায়। বিজ্ঞানীদের আশংকা; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সর্বাধিক ক্ষতির শিকার হবে যেসব দেশ তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেলের আইপিসিসি (২০০৭) প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে– বাংলাদেশ মারাত্মক হুমকির শিকার হবে। প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান শতকে তা আরো বৃদ্ধি পাবে; ২০৫০ সালের মধ্যে সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের ১৭% ভূ-ভাগ তলিয়ে যাবে। ফলে ৪কোটি লোক বাস্তভিটা, পেশা ও জীবিকা হারিয়ে অনিশ্চিত জীবন-যাপনে বাধ্য হবে; বেড়ে যাবে ভৌগলিক-রাজনীতিক-আর্থনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাস;
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে (১৯৮৮, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭ সালের বন্যাসমূহ উল্লেখযোগ্য);
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়েছে। সুনামি, সিডর, নার্গিস আইলার মতো ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল, পাহাড়ধ্বস ইত্যাদি ঘনঘন বা বেশিমাত্রায় হবে;
- শুষ্ক-মৌসুমে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কি.মি. পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে। এই শতকে তা বেড়ে ৩০০-৪৫০ কি.মি. পর্যন্ত যেতে পারে। লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে; মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে; অজন্মা দেখা দেবে;
  তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়বে। কৃষিজমির

- প্রাপ্তি/ উৎপাদন হ্রাস পাবে, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে;
  নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে। বিগত ২০০ বছরে প্রায় আড়াই হাজার নদ-নদীর বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে যে ৭০০ নদীর অস্তিত্ব আছে তার মাত্র ২০০টির মতো কোনোমতে নাব্যতা ধরে রেখেছে।
- বাকিগুলো শুকিয়ে গেছে, কিংবা বর্ষাকালে কিছুদিনের জন্য নাব্য হয়। অর্ধজীবিত-নাব্য মিলিয়ে ২০০ নদ-নদীর মধ্যে আগামী ৫০ বছরে অধিকাংশ মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হবে মেঘনা-যমুনার মতো নদীকেও;
- ফসলহানি ও ফসলের রোগ বৃদ্ধি পাবে, অপরিচিত রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ, ক্যান্সারসহ দুরারোগ্য ও প্রাণঘাতি রোগ, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো রোগ মহামারী আকারে বিস্তারের আশংকা বহুগুণ বেড়ে যাবে;
- গাছপালা-লতাগুল্ম সহ উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্য ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে;
  নিরাপদ খাওয়ার পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে;

ক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো আর্দ্রতা, নাতিশীতোষ্ণতা ও সুস্পষ্ট ঋতুগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থা দিন দিন শংকার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও পরিবেশ পরিপন্থি কার্যকলাপের ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পাখি, মাছ ও কীটপতঙ্গ চিরতরে হারিয়ে গেছে। পৃথিবীর বৃহত্তর নদী ব্যবস্থা ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিঠাপানির উৎস, মজুদ ও প্রবাহের অধিকারী বাংলাদেশ। অতি উঁচুমানের ভূ-বৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে গঠিত এদেশের পরিবেশ; অপার সম্ভাবনাময় এর আর্থনীতিক ভবিষ্যৎ; অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় এর নদী ব্যবস্থাসহ ভূপ্রকৃতি, অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা আজ চরম দুর্দশার মুখে। তাই পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের প্রাণভোমরা নদীব্যবস্থাকে বাঁচাতে যত কঠিন ও দুঃসাধ্য হোক একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকার ইতোমধ্যে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন:

- জাতীয় নদী ব্যবস্থা নীতিমালা সংস্কার এবং অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যাধুনিক নদী ব্যবস্থাপনানীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন;
- জনগণের অত্যাসন্ন দুর্ভোগ লাঘবের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সবক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত ক'রে, পরিকল্পনা অনুসারে, পরিবেশবান্ধব জাতীয় কর্মসূচি নির্ধারণ, নীতিমালা সংস্কার ও বাস্তবায়ন;
- নদ-নদীসহ পানি, মাটি, বাতাস, ফসল, খাদ্য দুষণমুক্ত ও দখলমুক্ত করা;
- পরিবেশসহ সব জাতীয় নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও যথাযথ বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা;
- বনভূমি সংরক্ষণ, নদী তীর, পাহাড় ও সমুদ্র উপকূলসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে বনায়ন করা;
- রাষ্ট্রীয় বাজেটে পরিবেশ সংরক্ষণ-ব্যয় বরাদ্দ এবং যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া;
  প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

নদীমালা আমাদের আবাসভূমি গঠন, জনপদ সৃষ্টি, খাদ্য জোগানসহ হাজার বছর ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে কৃষ্টি সংস্কৃতি। এই নদীমালা আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জাতীয় সম্পদ। দেহের রক্তকণিকার মতো পবিত্র এর জল। এ আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, ফসল ফলায়, জলসিঞ্চন করে ভূমিকে রাখে সরস উর্বর। নদীমালাই সৃষ্টি করেছে বনভূমি, জলাভূমি, বিল, বাওড়, হাওড় অসংখ্য প্রাণবৈচিত্র্য। নদী ব্যবস্থার সাথেই জড়ানো আমাদের জীবন-জীবিকা। আমাদের পরিবেশ, শিল্প, সাহিত্য আর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সবকিছুতেই রয়েছে নদীর অবদান। এটি স্মরণে রেখে বিদ্যমান নদ-নদীসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে।

সুন্দরবন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র ভাবনা

ড. আসম হেলাল সিদ্দীকি

বিভাগীয় কর্মকর্তা, ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। যার বিস্তৃতি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি জেলা যথা সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার নিম্নাঞ্চল তথা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উত্তরাংশের ভূভাগ। এর ভৌগলিক অবস্থান ২১°-৩০" থেকে ২২°-৩০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°-০০" এবং ৮৯°-০০"-৮৯°-৫৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার দক্ষিণের সাগর অবধি, খুলনা জেলার দাকোপ ও কয়রা উপজেলার সাগর পর্যন্ত এবং বাগেরহাট জেলার মোংলা, মোড়লগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলার দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এ বনের পরিসীমা। এ বনের মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশ সুন্দরবনের অংশ। বাকি ৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার অংশ। বাংলাদেশ সুন্দরবন অংশ ৬ঃ৪। বাংলাদেশ সুন্দরবন অংশ পূর্বে পিরোজপুর, বরগুনা, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে (ভারতের পশ্চিমবঙ্গের) হাড়িয়াভাঙ্গা উত্তরে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণাংশ। অর্থাৎ পূর্বে বলেশ্বর নদী পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা, উত্তরে পদ্মানদীর অববাহিকা, ভৈরব-মধুমতি, কপোতাক্ষের নিম্নাংশ, বাগেরহাটের দড়াটানা, পানগাছি, বলেশ্বর ইত্যাদির সংমিশ্রণ।

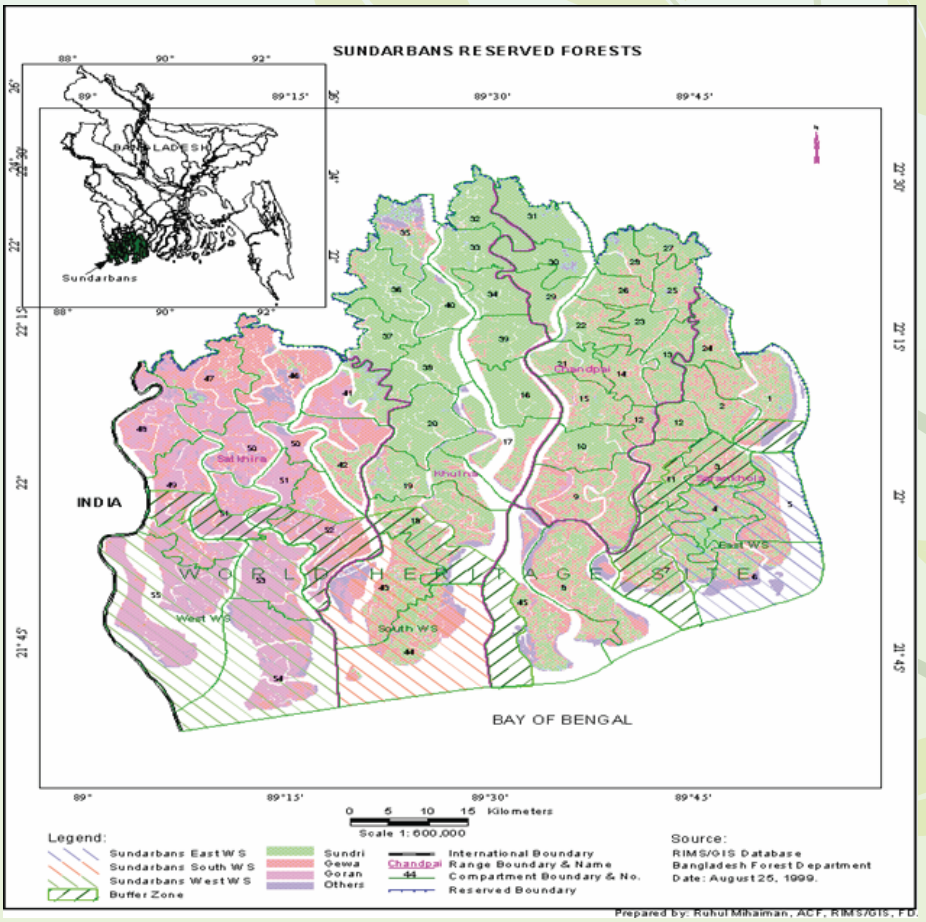

চিত্র-১। সুন্দরবনের মানচিত্র।

সুন্দরবন ভ্রমণ খুবই আকর্ষণীয়,চিতাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। সুন্দরবনে প্রতি বছর হাজার হাজার দেশী বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ সম্পাদন করে থাকেন। সুন্দরবনের চিত্রল হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বানর ও কুমির, বুনো শুকর, ডলফিন, সজারু ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপসহ ৩১৪ প্রজাতির পাখি এবং ৩৩৪ প্রজাতির গাছপালা ও উদ্ভিদের সমন্বয়ে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনে প্রায় ৪ শতাধিক নদী ও খাল রয়েছে। যেখানে দু'বেলা জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। জোয়ার ভাটার সময় নদ- নদী ও বনের পরিবেশ ও দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে যায়। প্রাণিরাও তাদের পরিবেশ বদলায়। সুন্দরবনের পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য তথা জীন বৈচিত্র, প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ বৈচিত্র্য বেশ আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন। যা শিক্ষা, বিনোদন ও গবেষণার উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত।

এমনিতেই সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ও বিস্তৃত সমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া। যা ১৯৯৭ সনে UNESCO কর্তৃক ৭৯৮ তম World Heritage Site ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ সনে সুন্দরবনের হিরন পয়েন্ট এর আকর্ষণীয় ফলক উন্মোচন করে বিশ্ববাসির দৃষ্টি কাড়েন। সুন্দরবন ৫৬০ তম প্রাকৃতির রামসার সাইট হিসাবেও পরিগণিত হয়।

সুন্দরবনের নদ-নদী জোয়ার ভাটার তারতম্য, নদীর স্রোতের অবস্থা, পানির লবণাক্ততা, পানি ঘোলা হওয়া, নদীতে চর পড়া, নদী ভাঙ্গন, নদী কিনারের বন ধ্বংস ইত্যাদি প্রক্রিয়া উজানের নদ-নদীর পানি প্রবাহের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। আমরা জানি উজানের তথা ভারতের প্রায় দুই শতাধিক নদী সবগুলিই আমাদের বাংলাদেশের নদীর সাথে মিশে আছে এবং বাংলাদেশের সবগুলি নদীরই উৎস মুখ ভারত, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশ। উল্লেখ্য আমাদের নদ নদী ও সমস্ত পানির মূল উৎস ভারত। মোট পানির শতকরা ৮ ভাগ বৃষ্টির পানি আর বাদ বাকি প্রায় ৯২ ভাগ পানিই ভারতীয় বিভিন্ন নদ নদী হতে আগত বা পাহাড় হতে নিংড়ানো।

ফলে পদ্মা নদীর উজানের ফারাক্কা ব্যারেজ, তিস্তার জল ডোবা ব্যারেজ আমাদের পানি প্রবাহের মারাত্মক হুমকি। শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে যে পরিমান পানি আমাদের পদ্মার বুকে আসার কথা তা আসে না। ফলে প্রায় সকল নদ নদীতে এর দ্রুত বিরুপ প্রভাব পড়ে ও পদ্মা, মেঘনা,যমুনার বুকে চর জাগে। সে কারণে উজানের পানির প্রবাহ কম থাকায় গড়াই, চিত্রা, মধুমতি, কপোতাক্ষ, ভৈরব, রুপসার বুকে হাহাকার করে। অন্য দিকে সুন্দরবনের প্রবাহিত ৪(চার) শত নদ-নদী ও খালে সমুদ্রের জোয়ারের তীব্র লবণাক্ত পানির প্রবাহ বেড়ে যায়; ঘোলা পানির প্রবাহের ফলে নদীর বাঁক, তীর ও চর ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলতে থাকে। নদীর নাব্যতা হ্রাসের ফলে সুন্দরবনের অনেকাংশে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে।

এ বছর এপ্রিল মাসের মধ্যমাংশে সুন্দরবনের নদীর পানির লবণাক্ততা অন্যান্য বছরের চেয়ে একটু বেশী। কম লবনাক্ত অঞ্চল যেমন- চাঁদপাই অঞ্চলে এ বছর এপ্রিল ১২ তারিখ পানির লবণাক্ততা ১৭ পিপিটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে ঢাংমারীতে, করমজলে ১৬ পিপিটি, জোংড়া-নন্দবালাতে ১৫ পিপিটি, চাঁদপাইতে ১৫ পিপিটি, কালাকগী ২৩, বানিয়াখালী ২৪, চুনকুড়ি ২৬, গেওয়াখালী ২৬, কলাগাছিয়া ২৭, কদমতলা ২৮ এবং কইখালীতে ২৮ পিপিটি। অন্যান্য বছর এখানে পানির লবণাক্ততা সকল স্থানেই অন্তত ৫ পিপিটির মত কম থাকতো। যদিও পূর্বে বলেশ্বর এর পানির প্রবাহের কারণে বগী, তোড়াবেকা ও শরণখোলায় পানির লবনাক্ততা নেই বললেই চলে অর্থাৎ ০ পিপিটি।

আর একটি মজার বিষয় সহজে দৃশ্যমান তা হলো উজানের পানি প্রবাহের গতি প্রকৃতির তারতম্যের প্রভাবে ঢাংমারী ফরেষ্ট অফিসের সামনের অংশে অনেকটা জায়গা চর জেগেছে এবং আরো এলাকা অর্থাৎ পেছনের হুলার চরের ব্যাপক অংশ আরো উঁচু হয়ে ধানসি ও কেওড়া বনে পরিণত হয়েছে। এ স্থানে নতুন জেগে উঠা চরে ও ফাঁকা জায়গা পূরণের লক্ষে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ এ

বনাঞ্চলে জন্মে না। এমন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ যেমন খলসি, কাকড়া, ঝানা, ভাতকাঠি, পশুর, কিরপা, বাইন, গোলপাতা, ধুন্দল, আমুর, সিংড়া প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষামূলক সফল বনায়নের মাধ্যমে বিপন্ন, বিরল ও এ অঞ্চলে জন্মে এসব প্রজাতির মাতৃবৃক্ষ সৃজন করছে। আশা করা হচ্ছে আগামীতে এ সকল অঞ্চলে ঢাংমারী অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির বীজ সন্নিহিত ব্যাপক অঞ্চলের ফাঁকা জায়গা প্রাকৃতিক ভাবেই পূরণ করতে পারবে। প্রত্যেকটি বৃক্ষে ফুল ফলে ভরপুর হয়ে উঠছে।

চিত্র-২। সুন্দরবনে ফাঁকা জায়গায় ম্যানগ্রোভ বিভাগ কর্তৃক রোপিত ভাতকাঠি গাছ।

চিত্র-৩। সুন্দরবনে ফাঁকা জায়গায় ম্যানগ্রোভ বিভাগ কর্তৃক রোপিত বিভিন্ন প্রজাতির গাছ।

যেমন ধুন্দল বঙ্গোপসাগরের নদীর কিনারের প্রজাতি; ভাতকাঠি, ঝানা, কিরপা, খলসি প্রভৃতি জংগলের অন্যত্র জন্মে। কিন্তু সুন্দরবনের প্রায় সকল নদীই উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়ায় জোয়ারের পানি বনের মধ্যে কয়েক কিলোমিটারের বেশী বীজ বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। ফলে পশ্চিমের খলসি প্রজাতি পূর্বের শরণখোলা, সুপতি অঞ্চলে বিস্তার ঘটাতে পারে না। কাজেই নদীর উপর ও জোয়ারের স্রোতের উপর সুন্দরবনের বীজ ও চারা গজানো ও টিকে থাকা নির্ভর করে।

চিত্র-৪। সুন্দরবনে ফাঁকা জায়গায় ম্যানগ্রোভ বিভাগ কর্তৃক রোপিত কাকড়া গাছ।

চিত্র-৫। সুন্দরবনে ফাঁকা জায়গায় ম্যানগ্রোভ বিভাগ কর্তৃক রোপিত খলসি গাছ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি চাঁদপাই অঞ্চলে চাঁদপাই স্টেশন সংলগ্ন জেটির কথা; সেখানে মাত্র ১০ বছর আগেই অনেক গভীর ছিল। বর্তমানে যে স্থানে চর পড়তে শুরু করেছে। অপরদিকে মিরগামারীতে উত্তর দিকে নদী ভাঙ্গনে বেশ বনাঞ্চল নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থা নন্দবালা ক্যাম্পের পার্শ্বের পশুর চ্যালেনের পূর্ব তীরের অবস্থাও প্রায় একই রকম। এখানে প্রায় প্রতিনিয়ত নদী ভাঙ্গন ও মাটি ক্ষয়ের মাধ্যমে অনেক গাছ ও বনভূমি নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে।

চিত্র-৬। সুন্দরবনে নতুন চরে ম্যানগ্রোভ বিভাগ কর্তৃক রোপিত বাগান।

চিত্র-৭। সুন্দরবনে পশুর নদী ভাঙন।

কচিখালির পূর্বদিকের ডিমের চর, পক্ষির চর বিগত দুই দশকে বর্ধিষ্ণু হতে শুরু করে এখন বিশাল ভূ-ভাগ ও বনাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কটকার সেই প্রান্তিক রেস্ট হাউজ, ঝাউ বাগান, রাস্তা, করঞ্জা গাছ, কেওড়া গাছ, সবই তার ঐতিহ্য হারিয়ে মাটি ক্ষয় হয়ে অসীম সমুদ্রের ঢেউ ও জলরাশির ধবল আঘাতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। তবে উন্নয়নের ছোয়া ডিজিটাল বাংলাদেশের নমুনা শুধুমাত্র টেলিটকের টাওয়ার নির্মাণ টেলিটক সিম এর মাধ্যমে সমগ্র দেশ পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ কর সম্ভব হচ্ছে। তবে এখানে দর্শনার্থীদের জন্য জ্ঞাতব্য সাথে অবশ্যই টেলিটকের সিম আনতে হবে। প্রিয়জনের সাথে এ নির্জন বঙ্গোপসাগরের তীরের কটকার মাটি তথা মানচিত্রের শেষ ভূ-ভাগ হতে এখানে পুরাতন আশির দশকের ঐতিহ্য হারানো স্থান হতে কটকার পিছনের সুরক্ষিত কাঠের তৈরী ক্যাটওয়াক এর উপর দিয়ে নির্ভয়ে প্রায় আধা কিলোমিটার হাঁটা ও নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন হরিণের ঝাঁক, বাঘ, বুনো শুকর, বানর, পাখি ইত্যাদি দেখার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। তবে এখানে ঐতিহ্যবাহী প্রান্তিক রেষ্ট হাউজ সিডরে বিধস্ত হলেও পাশেই একটি টিনের ছাউনি রেষ্ট হাউজ করা হয়েছে।

কটকাতে এখন পানিতে লবনের পরিমান ১৭ পিপিটি। নদীর পানি নীল- সবুজ। একটু বলা দরকার সুন্দরবন ও সমুদ্রের পানি যত স্বচ্ছ ও নীল হবে পানিতে লবণের পরিমান তত বেশী। কটকার পূর্ব দিকের জামতলা খাল, পল্টুন ওয়াচ টাওয়ার এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। পূর্বের জরাজীর্ণ কাঠের ওয়াচ টাওয়ার ও জেটি খুব খারাপ ছিল। বর্তমান পল্টুন, রেলিং বেশ ভাল তবে ওয়াচ টাওয়ার পর্যন্ত রেলিং নির্মাণ বা ক্যাট ওয়াক তৈরী করে দর্শনার্থীদের জামতলা ফাঁকা মাঠের হরিণ ও বাঘের বিচরণ উপভোগ করা যেতে পারে। পূর্বে যেমন জামতলা ওয়াচ টাওয়ারের পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ ছিল তা এখন নানা প্রকার ম্যানগ্রোভ ও নন ম্যানগ্রোভ প্রজাতির দ্বারা পূরণ হয়ে ঝোপ-ঝাড়ে পরিণত হয়েছে। আগামীতে বা কয়েক বছরের মধ্যেই ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ বনভূমিতে পরিণত হবে। ফাঁকা জায়গায় বদলে বনবনানি, পাক-পাখালি, ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ, বানর, বাঘ, বিচিত্র ধরনের পাখির কল কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠবে।

এবার সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে পশুর, খলসি, ধন্দুল ও কেওড়া গাছে প্রচুর ফুল হয়েছে অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে এবার মধু যেমন বেশী উৎপাদন হবে তেমনি এ সকল প্রজাতির বীজ ও চারার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

সুন্দরবনের লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। জোয়ারের পানি বনভূমিতে সব সময় পৌছে না। জলদস্যু, বন দস্যুদের অবাধ বিচরণ, বন্যপ্রাণী নিধন, পাচার, আন্তর্জাতিক দুষ্টু চক্রের সাথে বন দস্যুদের সখ্যতা, বন ও বন্যপ্রাণী ধ্বংসের অন্যতম কারণ। বর্তমানে সুন্দরবেনর সুরক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগে পাহারা ও মনিটারিং দোরদার করা হয়েছে। দেশী বিদেশী সকল সংশ্লিষ্ট মহল সুন্দরবনে সুরক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। কাজেই আশা করা যায় আগামীতে সুন্দরবনের সুরক্ষা Automatically হয়ে যাবে। জনগণ সচেতন ও সজাগ হয়েছে। সরকারও সুন্দরবন সুরক্ষায় অতিতৎপর। এখন বনবিভাগ সহ সংশিষ্ট সবাই জবাবদিহিতার মধ্যে রয়েছেন। সুন্দরবনের দস্যুবৃত্তি কমে এসেছে। গাছ চুরি, কাঠ চুরি, হরিণ শিকার, বাঘ শিকার নেই বললেই চলে। এভাবে যদি জনগন এবং সংশিষ্ট পেশা জীবীদের মন মানসিকতা ও চরিত্র বদলায় তবে আপনা আপনিই সুন্দরবন সুরক্ষিত হবে। কারণ সুন্দরবন প্রাকৃতিক বন। প্রাকৃতিক ভাবেই এর জন্ম, বিস্তার, ক্রমবর্ধন হয়েই অনন্তকাল টিকে থাকবে সুন্দরবন।

সুন্দরবনে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে পাতা, ফুল, ফল, ডালপালা পড়ে পঁচে মাটিতে হিউমাস জমছে। ফলে মাটিতে ভাল গাছ মরে পচেঁ গলে Microorganism এর বৃদ্ধির পরিবেশের প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়না।

এজন্য সুন্দরবনের টেকসই ভ্রমণ, পরিবেশ, Safety and Security উন্নয়ন করতে হবে। নিরাপদ ও ভয়হীন স্বাচ্ছন্দপূর্ণ সুন্দরবন ভ্রমণ টেকসই সুন্দরবন ভ্রমণের পূর্বশর্ত। সুন্দরবন ভ্রমণের শান্তিপূর্ণ ও স্বাস্থ্য সম্মত করার জন্য সুন্দরবনের সকল এন্ট্রিপয়েন্ট যেমন, মংলা, মুন্সিগঞ্জ এবং শরণখোলায় বনবিভাগ বা কোন সরকারি এজেন্টের মাধ্যমে সুন্দরবনে ভ্রমণের একমাত্র বাহন জলযান, নৌকা, ট্রলার, স্পীডবোট প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ধারিত হারে জলযান ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করতে হবে। এখানে যেন কোন মধ্যসত্বভোগী দালালের বিচরণ না থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। সুন্দরবনের দস্যুবৃত্তি চিরতরে নির্মূল করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য, পানীয় এবং ঔষধ পত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল এন্ট্রি পয়েন্ট এবং সুন্দরবনের মধ্যে স্থান বিশেষে আরো রেস্ট হাউজ, হোটেল-মোটেল ইত্যাদি থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

যদিও বর্তমানে সুন্দরবনে দস্যুতা অনেক কমে এসেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর হস্তক্ষেপে সুন্দরবনের অনেক বন থেকে জলদস্যু নির্মূল হয়েছে এবং অনেকে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। সম্প্রতি সুন্দরবনের মাস্টার বাহিনী খ্যাত বাহিনীর বিপুল অস্ত্রসহ বাহিনী প্রধান মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে এ ঘটনায় আগামীতে সুন্দরবন সুরক্ষা, প্রকৃত ও জীব বৈচিত্র তথা পরিবেশতন্ত্র সুরক্ষিত হবে এবং সুন্দরবন ভ্রমণে দেশী বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে।

কারন আমাদের সুন্দরবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য-বিশ্ববাসির আকর্ষণ করলে আমাদের পর্যটন শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন ঘটবে ফলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ফলে এখানে নির্ভরশীল ভোক্তা তথা Stake Holder গণও নানাভাবে উপকৃত হবে। এ ফলে দেশ জাতি তথা সরকার বিশ্ববাসির কাছে নন্দিত হবে এবং সাথে সাথে সুন্দরবন পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে ও গুরুত্ব বাড়বে।

তবে আমার উপলব্ধি সুন্দরবনে সকল নদীর তীর, নতুন চর, চরের কেওড়া বনের ভিতরের অংশ, অপ্রধান বনজ, লতাগুল্ম সম্মৃদ্ধ বনাঞ্চলে উন্নত, অর্থকরী ও মূল্যবান পরিবেশীয় উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধ, খাদ্য চক্র ও খাদ্য শৃংখল সমৃদ্ধকরণ প্রভৃতি প্রকৃতি বান্ধব গবেষণা ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সুন্দরবন উন্নয়ন, টেকসই ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন ও ব্লু ইকোনোমির আওতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা এবং ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বাঘের বাড়ী সুন্দরবন

মার্জিয়া লিপি
লেখক, গবেষক ও পরিবেশবিদ

ডোরা কাটা বাঘ, চিত্রা হরিণ, নানা রঙের পাখি, গাছ-লতাপাতা আর জলের কুমির নিয়ে এই সুন্দরবন। প্রকৃতি দু'হাত উজার করে যেন ঢেলে দিয়েছে তার ঐশ্বর্য্য জনমানবশূণ্য এই বাদাবন সুন্দরবনে। এই বন, যেমন ভয়ংকর তেমনি অনন্য সুন্দর, ক্ষণে ক্ষণে এর রুপ বদলায়। এবনের নির্জন দুপুরের রূপ অচেনা, ভোর গুলো আবার অন্যরকম স্নিগ্ধ, জোৎস্না রাতের সৌন্দর্য অপার্থিব, যেন অন্য পৃথিবীর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সপ্তমাশ্চর্য সুন্দরবন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় একক ম্যানগ্রোভ বন । এ বনে জালের মতো জড়িয়ে আছে সামুদ্রিক জল ধারা, বাদাবন আর ছোট ছোট বনদ্বীপ যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভূমি বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে 'বিশ্বের ঐতিহ্য' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রের নীচে যে হালকা নীল রঙ তাই পদ্মানদীর মোহনা। উৎস ভূমি হিমালয় থেকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি শেষে মিলিত হয়েছে এই নদী, বঙ্গোপসাগরে। সুন্দরবনের অবস্থান এই উপসাগরের মোহনায়, যেখানে প্রাকৃতিক ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় বন দ্বীপ। এই বন দ্বীপ গুলোতে স্থলপথের কোনো চিহ্ন নেই, অসংখ্য খাল-বিলে ভরা, সবদিক থেকেই দূর্গম, দূর্বোধ্য। জলপথ ছাড়ামোহনার এই দ্বীপ গুলোতে প্রবেশের আর কোন পথ নেই। চারপাশে দৃষ্টিসীমায় শুধু জল আর জল।

চিত্র: মানচিত্রে সুন্দরবন

জোয়ার ভাটার এই বাদাবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল দিনে দু'বার ডাঙার দিকে এগিয়ে আসে। এসময়ে খাল-বিল, নদী-উপনদী-শাখা নদী বাড়তি জলে ফুলে-ফেঁপে-উপচে উঠে। জোয়ারের সময়

পুরো সুন্দরবনই প্রায় জলমগ্ন হয়ে জলে ভাসতে থাকে। এই বনের নতুন চরে প্রথমে জেগে উঠে ধানসী, পরে জন্মে কেওড়া, গরান, বাইন, পশুর, ধুন্দল, সবশেষে সুন্দরী গাছ।অনেকের মতে সুন্দরী গাছের নামে এ বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুন্দরবন, যেখানে সময়ের সঙ্গে সৌন্দর্যের রঙ বদলায়।

বনবিভাগে কাজের সূত্রে সুন্দরবনের দূর্গম গহীনে যেয়ে দেখেছি দর্শনীয় অনেক কিছুই। বছর কয়েক আগে প্রকৃতি পর্যটনের গবেষণায় এসেছিলাম সাতক্ষীরা রেঞ্জ দিয়ে কারণ একটাই, সমগ্র সুন্দরবনের মধ্যে এই রেঞ্জেই সবচেয়ে বেশি দেখা হয়ে যায় বাঘের সাথে। পরিসংখ্যানে ভিন্নতা রয়েছে তবে প্রায় ৪০০ এর অধিক বাঘ রয়েছে এই বাদা বনে।

সুন্দরবনের বাসিন্দা পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার হিংস্রতায় যার জুড়ি নেই, এমন ভয়ংকর মানুষখেকোর আড্ডা আর কোথাও নেই। কৌলিণ্যের বিচারে বাঘকে বলা হয় দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনে বাঘকে সমীহ করে মামা বলেও ডাকা হয়। হলদে ডোরা কাটা বিশাল দেহখানা ঝোপের আড়ালে আবডালে যখন নিঃশব্দে চুপিসারে হাঁটে, তখন বনের প্রহরী প্রাণীরা তীব্র স্বরে ঘোষণা করে আতংক ভরা সংকেতের ধ্বনি। গাছের ডালে ডালে লাফালাফি আর চিৎকার শুরু করে বানরের দল, বুনো শুয়োর, হরিণ একটানা ভয়ার্ত ডাকে প্রাণভরে দৌড়াতে থাকে, বনের পাখিরা সশব্দে আকাশে দল বেধেঁ উড়ে শূণ্যে মিলিয়ে যায়।

সুন্দরবনের দুর্গম বাদার প্রতিটি দ্বীপেই বসবাস করে মানুষখেকো বাঘ। সময় সময় বাঘ দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে আসা যাওয়া করে কখনও খাবারের সন্ধানে আবার কখনও সঙ্গীর প্রয়োজনে। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত বাঘেদের মিথুন রিতু, সেই সময়ে বাঘ সঙ্গীর সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। প্রয়োজনে সাঁতার দিতেও সে পিছপা হয়না। স্রোতের সঙ্গে সমকোণ তৈরী করে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত বাঘ, তা স্রোত যত শক্তিশালী হোক না কেন। তীব্র স্রোতের মধ্যেও সে এতটুকু লক্ষ্যচুত হয়না, বার বার চেষ্টা করেও সে সোজা সাঁতার দিয়ে উঠে।

সুন্দরবনে প্রকৃতি পর্যটনের গবেষণায় ও অভিযান টিমে ৬ জন সহকর্মী ছাড়াও বন বিশেষজ্ঞ খসরু চৌধুরী, বিদেশী পরামর্শক রবার্ট, এন্থনী ল্যাথম, লুইস জ্যা চেভেস, প্রশিক্ষক জাহানারা নূরী, ট্যুর গাইড, কেবিন ক্রু, ক্যামেরাম্যান ও দুজন বন প্রহরীসহ মোট ২২জন। খুব সকালে আমরা ঘাটে এসে পৌঁছলেও জাহাজের কিছু যান্ত্রিক সমস্যার কারণে যাত্রা শুরু করি মাথার উপর সূর্যকে রেখে। জাহাজ চলার আধাঘন্টার মধ্যেই দ্যা গাইড ট্যুরের মুগলী রুবাইয়্যাৎ ভাই এর হঠাৎ চিৎকারে চোখ পড়লো একটা শুশুক পরিবারের উপরে। ঝুপ করে এক ডুব দিয়ে একটু পরেই আবার পানিতে ভেসে উঠছে ছোট বড় শুশুরগুলো, পর পর কয়েকবার ভাসছে আর ডুবছে।

এবারের যাত্রার শুরুতেই আমরা বুড়িগোয়ালীনির কাছাকাছি কলাগাছি বনটহল ফাঁড়িতে নেমে শুরু হয় অভিযান। কলাগাছি ফরেষ্ট ক্যাম্পের ঠিক পেছনে রয়েছে বনের ভিতর দিয়ে একটা হাঁটা পথ। এই হাঁটা পথেই প্রায়ই বনের রাজা বাঘ মামারা হাঁটাহাঁটি করে। শেষ বিকেলে বনের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে বাঘে পায়ের ছাপ দেখে টেরপেলাম বাঘের অস্তিত্ব।

একটু দু:সাহসী হয়ে কলাগাছি থেকে সন্ধ্যায় জাহাজে উঠে যাত্রা শুরু করি মান্দারবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে। বাতাসে লোনা পানির গন্ধ, জন্তু, জানোয়ার আর নিশাচরের পদচারণে রহস্যময় রাত, নির্জনতার রূপ যেন অচেনা অন্যরকম। সন্ধ্যার পর গাঢ় অন্ধকার নেমে এলো সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা নদীর বুকে। ঘোর অন্ধকার ভেদ করে ইঞ্জিনের শব্দ আর চার্জ লাইটের আলোয় মুগ্ধ হতে হতে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে যখন দল বেঁধে কয়েকটা নৌকা আমাদের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে তখন মনে মনে ভাবছিলাম রূপকথার জলদস্যুদের। অবশেষে মাঝরাতে জাহাজ নোঙ্গর করলো মান্দারবাড়িয়ার সমুদ্র সৈকতে।

হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর তীরে মান্দারবাড়িয়ায় বন আর বেলাভূমির যুগল মিলন। আমার দেখা এক অন্য রকম অপার্থিব দৃশ্য। অনুভবে দেখছিলাম প্রকৃতির অতলে সৃষ্টির বিচিত্রতার বিস্ময়! ভোরের আলোতে কেবিন থেকে বের হয়ে দেখি এক পাশে বিশাল সমুদ্র আর অন্য পাশে ঘন বন। গাছপালা আর লতাগুল্মে আচ্ছাদিত রহস্যময় ঘনবন, মনের রহস্যকে আনমনা করে দেয়, মনোজগতে তৈরি এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার টান।

প্রায় ৮ কিলোমিটার লম্বা এই সমুদ্র সৈকত যেন ছবির মত । অসম্ভব ভালোলাগার আচ্ছন্নতায় মুগ্ধ। কক্সবাজার, টেকনাফ, উখিয়া, ইনানী, সেন্টমার্টিনসহ বঙ্গোপসাগরের অনেকগুলো সৈকত বেশ কয়েকবার দেখেছি। সুন্দরবনে এসে এত বড় একটি সৈকতের দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। কিন্তু মান্দারবাড়িয়া সৈকতের সাথে অন্যকোনো সৈকতের একটুও মিল নেই। অপূর্ব সৌন্দর্য ঘেরা এক জায়গা। পিছনে বাঘের ভয় আর সামনে অসম্ভব ভালোলাগার হাতছানি দেয়া সমুদ্র, বিস্তীর্ণ সৈকত,সবুজ রহস্যে ঘেরা বন। নির্জন সৈকতে নষ্টালজিয়ার লাল-নীল-সবুজ রঙের লতাপাতার জালে জড়িয়ে নিজেকে খুঁজতে থাকি অন্যরকম ভিন্ন এক অনুভূতিতে।

সমুদ্র সৈকত তটে ঘুরতে ঘুরতে পেলাম সামুদ্রিক কচ্ছপ, রাণী কাঁকড়া, হরিণ আর বাঘের পায়ের ছাপ। তার মানে কিছুক্ষণ আগেই এখানে হরিণ আর বাঘ মামারা হাঁটাহাঁটি করেছে। মান্দারবাড়িয়ায় ফরেষ্ট ষ্টেশন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ভোর বেলায় বাঘ এসেছিল। বাঘের পায়ের সদ্য ছাপ দেখার পর থেকে আবারও বাঘ দেখার নেশা আরেকটু জাঁকিয়ে বসলো। পায়ের ছাপের পিছুপিছু কিছু দূর যাওয়ার পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম জাহাজে। মানচিত্রে দেখলাম দক্ষিণে তালপট্টির অবস্থান। সুন্দরবনে এমন অনেকগুলো ছোট বড় সমুদ্র সৈকত আছে। কচিখালি থেকে কটকা এরকমই নির্জন সুন্দর ৭ কি. মি. দীর্ঘ আরেকটি সমুদ্র সৈকত।

যাত্রার এ পর্যায়ে উদ্দেশ্য হিরণ পয়েন্ট। দুপুরের মধ্যে পুষ্পকাঠির হিরণ পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম আমরা। সবাই ব্যস্ত নীলকমলে বিশ্ব ঐতিহ্য চিহ্নের পাশে নিজের স্থির চিত্রকে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্যে। প্রকৃতি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় কাজ করার জন্যে মনে মনে সুন্দরবনের জন্যে আমারও এক রকম গর্ব আর অহংকার উঁকি দিল। দলের মধ্যে থেকে তিনজন হিরণ পয়েন্টে পিছনের হাঁটা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম ক্যামেরা অন করে। এবারও আমাদের সাথে বন্দুকসহ প্রহরীরা । বনের ভিতর কোষ্টগার্ডের দপ্তর থেকে প্রায় অনেকটা পথ আসার পর দেখি বিশাল শন বন।

এ পথের শুরুতে কয়েকজনের সাথে দেখা হলেও এখানে এসে আর কাউকেই পেলাম না। শন বনের আবহাওয়াটা কেমন যেন একটু গুমোট। স্নিগ্ধ শন শনে হাওয়া বইছে চারিদিকে। নীরব, নিশব্দ এলাকা। একটু শব্দ হলেই গাঁ ছমছম করে কাঁপছে। এই বুঝি বাঘ চলে এলো। বাঘের ছবি তোলার নেশায় আবার সাহস জোগাচ্ছি একে অপরকে। কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছি না। হঠাৎ শন বনের মাঝে আবিষ্কার করলাম হ্যালিপ্যাড। এখানে হ্যালিক্যাপ্টার ল্যান্ড করে। জায়গাটা শনে ঢেকে আছে। দূর থেকে বোঝার উপায় নেয়। আমরা সেখান থেকে আরও একটু এগিয়ে গেলাম ঘন বনের দিকে। জানি না কোথায় বাঘ বসে বিশ্রাম নিচ্ছে নাকি শিকারের আশায় চুপচাপ ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় আছে? বাঘের পায়ের ছাপ দেখতেই ভয়টা সবাইকে আরও বেশি ঘিরে ধরল। হঠাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের পাল দিগবিদিক শূন্য হয়ে দ্রুত ছুটছে আর ছুটছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি আশেপাশে কোথাও বাঘ আছে।

Wildlife farming: Does it really help in conservation?

Md. Modinul Ahsan
Divisional Forest Officer & Warden
Wildlife Management & Nature Conservation Division, Khulna

Possessing wildlife and its products are often regarded as status symbol (!) in our society and in many other countries as well. In those countries there are some so called **"conservationists"** who suggest for wildlife farming to reduce pressure on the wildlife of the forests and other ecosystems. Basically wild animals are considered superior because of their rarity and high expense. Because rare species are associated with status it increases the consumer's willingness to pay, which further increases the demand and eventually add greed to avail species from the wild. Some species are already commercially bred to meet the high demand for their products and this is referred to as wildlife farming. It has also been argued that legal wildlife farming can prevent poaching/killing/stealing if the following criteria are realized:

i) The demand will be met by legitimate products and cannot increase as a result of legalization and increased accessibility,
ii) The legal supply will be a substitute for products retrieved from wild populations,
iii) A legal supply will be more cost-effective than illegal products and

It is erroneously assumed that the wildlife farming is helpful in conservation but in the long run the wildlife farming can never help in wildlife conservation rather it helps in diminishing wildlife population for various negative effects which is proved by many conservationists. However, the reasons why the wildlife farming is not conducive for wildlife conservation in the wild are mentioned below:

i) Wildlife Farming can never meet the demand of wildlife and its parts

The wanting of most wildlife products by far exceeds what commercial breeding can currently or realistically offer. For instance, musk deer, *Moschus* spp., are bred in captivity to provide musk to the market in traditional medicine, yet farms are currently only capable to meet 0.3%–1.2% of the demand, and it is considered unlikely that domestic demand will ever be met Similarly, despite the fact that 12,000 bears are held in Asian farms for the production of bile, demand has been increasing, and commercial trade is unlikely to become sustainable. The demand for rhino horn and subsequent poaching has increased as well, which has been attributed to human population growth and the increasing consumer market, the rapid growth of the Asian economy and greater income for most consumers, and

the settlement of middleman traders in key source countries in Africa. The same has been observed for elephant ivory, for which demand has been increasing since 1990 concurrent with increasing economic wealth. Another major concern is that wildlife farming and legalized trade is likely to increase demand further. Allowing trade in wildlife products will legitimize their consumption, counteract the ethical unacceptance of buying illegal wildlife products, and encourage more consumers to buy the products as it is now considered acceptable. It has been suggested that demand for wild tiger products will be unaffected if tiger farming is legalized, unless a stigma effect is enforced with a monopoly chapter. When farmed prices are kept high by a monopoly firm, they can prevent illegal products from entering the market. This would require regulatory restrictions, certified products, and monitoring by an outside certifier. However, wildlife farming is not a monopoly industry and is unlikely to become so in the future, and many wildlife industries are currently controlled by multiple *criminal* network. The farmed breeding of tigers has increased product availability in China, and tiger parts are now being used in a larger variety of medicines, as well as in wine. Because real-life examples of the economic impact of wildlife farming are scarce, conservationists have often relied on model-based approaches. It is most often predicted that, due to an imperfect self-regulating market, the demand for wildlife products will not be displaced by commercial breeding. Furthermore, demand is likely to increase, which will intensify the pressure on wild populations.

ii) Legal supply cannot be a substitute for products retrieved from wild

The major problem is that the use of animal products is deep-rooted in many cultures, mainly for traditional medicines, which makes the industry difficult to eradicate. For instance, although many Asian countries have removed rhino horn from their traditional medicine pharmacopoeias as there is no scientific evidence for any medical value, the demand for rhino horn has not yet been declined. This shows that spiritual beliefs outweigh scientific reasoning, which is the underlying problem of the second criterion stating that farmed products should satisfy consumers' needs, thereby substituting for products retrieved from the wild. On the other hand, 71% of the consumers of tiger derivatives prefer wild over farmed products. Similarly, consumers of bear bile prefer wild over farmed products because of believed differences in medicinal effectiveness. As long as the consumers' preference for wild animal products remains, farmed products cannot offer a substitute, and poaching will remain a threat.

Consumer inclination on wildlife products is based on quality and taste, which is believed to be different between wild and farmed species. Wild meat or bush

meat for instance, is very popular in Vietnam, and high demand has led to the overexploitation of wildlife. Some species are being captive bred to meet the demand for meat, including turtles, snakes, porcupines, and monkeys, yet with little success because farmed meat is considered inferior, as consumers claim it to be of lower quality and lesser taste. This causes the demand for wild animals to remain constant despite the availability of farmed alternatives. This has been most apparent for Asian turtles, for which the nutritional properties of wild animals are believed to be much higher than those of captive-bred animals. As a result, the last remaining wild populations of many endangered turtle species are being exploited to the point of extinction. Similarly, the quantity of wild orchids on Asian markets was unaffected by the flood of farmed plants, as the preference for wild specimens remained persistent.

Recent survey on the demand for sturgeon caviar, consumers were asked to taste two caviars and indicate their preference: they were told that one originated from a rare species and one from a common one. Even though the caviars were identical, 70.2% of the consumers preferred the caviar of the rare species. The wild meat industry in Vietnam is also strongly associated with social status, and regular consumers are generally business people, finance professionals, and government officials. The result is an increase in the market price for endangered animals, which leads to greater efforts to exploit the last remaining individuals. This has also been the case for butterflies caught for decorative purposes in Papua New Guinea, for which the price paid directly relates to the rarity of the species. The exotic pet industry also demonstrates that people will pay considerably more for rare animals. The price that bird collectors pay for rare parrots such as Hyacinth macaws, *Anodorhynchus hyacinthinus,* and Spix's Macaws, *Caynopsitta spixii*, went up to over US$ 20 000 after these species became extremely rare in the wild, further increasing poaching pressure. Two newly described reptiles (the turtle *Chelodina mccordi* and the gecko *Goniurosaurus luii*) were rapidly collected to near-extinction due to their rarity and willingness of eager pet owners to pay up to US$ 2000 for a single individual. Also in the trophy hunting industry rare animals are higher valued. In South Africa, hunters will pay up to 26% percent more for rare antelopessuch as sable, *Hippotragus niger*, than for common antelopes such as impala, *Aepyceros melampus*, or kudu, *Tragelaphus strepsiceros*. Consumer preference for rare species leads to the fear that if farmed animal products become easily accessible, consumers will change their interest and crave products from rarer animals. For instance, the demand for tiger parts has already shifted to snow leopards, *Panthera uncia*, and clouded leopards, *Neofelis nebulosi*.

iii) Legal supply cannot be cost-effective

Unfortunately, it is rarely the case that breeding farms are more cost-efficient than poaching, due to feeding, housing and production costs. The main problems faced by wildlife farming are the animals' social behavior, energy requirements, reproductive rate, growth rate, and space requirements. These can be explained by means of some examples;

- Social behavior can become a problem when an animal is highly territorial and intolerant of other individuals in its close surroundings. However, captive or commercial breeding of wildlife rarely succeeds due to its complicated social structure, which makes wildlife farming non-viable;
- Energetic requirements of species can make them expensive to rear in captivity, which is mainly the case for carnivores and frugivores. Farming of American bull frogs, *Rana catesbeiana*, in Indonesia was meant to uplift export production of frog legs and take the pressure off native species, but many farms closed down due to high maintenance costs;
- The reproductive and growth rates of animal are often too slow to produce meat or derivatives at an economically viable rate. Green pythons, *Morelia viridis*, for instance, are in high demand as pets. Because of their long reproductive cycle and the fact that they only turn green at a length of 65 cm, it is unlikely that they can be bred fast enough to meet the high demand. Captive breeding or sustainable harvesting has also been proposed for rhinos in Africa. However, rhinos rarely produce fertile offspring in captivity, only reach sexual adulthood between 6 and 8 years of age, and only have one young per litter. Additionally, horns of young adults grow by only 6 cm per year on average, and the rate even decreases with age. Although rhino horn harvesting could have economic benefits, it will never produce horn at a rate fast enough to meet the demand from Asia;
- A final problem faced by wildlife farmers is that the space requirements of many species cannot be met in captivity. Pangolins are hunted for their meat and although captive breeding could form an important tool to protect wild populations, their specialized behaviour and high dependence of natural ecosystems prevent successful farming. These examples show that commercial farming is not an option for many animals threatened by the wildlife trade.

When wildlife farming comes with several additional production costs, it can create imperfect competition in the market. For instance, to produce a kilogram of tiger bones in captivity is 50%–300% more expensive than to retrieve this from a poached tiger, which means that the illegal hunting of wild tigers will remain an

attractive alternative. A comparison made for ivory prices revealed that legally harvested tusks were sold for approximately US$ 450 per kilogram, whilst illegal tusks were sold for only a third of that price. For the same reason, parrots are still illegally smuggled into the USA because they can be sold for less money than commercially bred birds. The high expense of wildlife farming raises the question whether the market in illegal animal products can be replaced. Even if farmed products were to become cheaper in the future, there is a risk that competition with illegal suppliers will result in higher market prices and subsequently a higher poaching pressure. More importantly, the illegal market in wildlife products is controlled by a small numbers of traders and criminal groups who make high profits, and large numbers of poachers who earn comparatively little and have no influence on market prices. This means that fluctuations in market prices, even if they were to decrease, will have little impact on poachers, who often lack any other form of income. What a poacher receives for a dead tiger or rhino is unmatched by the income of any average job in the third world. For instance, an elephant tusk will bring in money comparable to 10 times the average annual income in poor African nations. Rhino poachers are normally paid a once-off amount that does not relate to the horn's value, size or mass and is therefore not directly influenced by market prices. So, even when wildlife farming is able to compete with the illegal trade, poachers will not have any motive to stop their activities. The money is simply too good, and the risks are relatively low.

Conclusion

Commercial farming and a legalized trade in farmed products will have the negative impact to what is desired for conservation. Prime reasons are the consumers' preference for wild products, the ongoing dependency on the wild population, and laundering of illegal products into the legal wildlife trade. Furthermore, wildlife farming could only work as a conservation tool when the demand is not increased by the legal trade and when farming becomes more cost-efficient than illegal harvest which is very difficult to execute and for this reason we should never think about wildlife farming.

Adopted from

1.Tensen, L. 2016. Under what circumstances can wildlife farming benefit species conservation? Review Paper. Global Ecology and Conservation 6(2016) 286- 298. Molecular Zoology Laboratory, Department of Zoology, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa

2.URL:http://envietnam.org/index.php/news-blog/800-wild-life-farming-brings-profit- not-conservation. Accessed and retrieved on 06 March 2019.

জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষতিকর প্রভাব ও বাস্তবতা

ইবতিসামুল জান্নাত মীম
মোঃ গোলাম রাব্বী

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিষয়ক বিষয়বস্তু যার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদনে হুমকি থেকে শুরু করে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব শুধু মাত্র বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রুপেই নয় বরং এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হচ্ছে।

বায়ুমন্ডল, ভূ-মন্ডল, মিষ্টি ও লোনা পানি, স্থল ও সাগরের বরফ এবং সব জীবের সমন্নয়ে জলবায়ু তৈরী হয়। জলবায়ু হল একটি এলাকার সাধারণ আবহাওয়া। বিভিন্ন মৌসুমে জলবায়ু বিভিন্ন রকম হতে পারে। যদিও জলবায়ু কিছু ঘন্টার মধ্যেই পরিবর্তন হতে পারে আবার শতবছরও লাগতে পারে। পৃথিবীর বা যে কোন একটি অঞ্চল বা শহরের জলবায়ুর দীর্ঘ সময়ে যে পরিবর্তন হয় তাই জলবায়ু পরিবর্তন। এর মধ্যে উষ্ণতা, শীতলতা এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর জলবায়ু সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। অতীতে পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণ ও শীতকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার প্রতিটি কাল বছরের পর বছর অবস্থান করত।

জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা

১৮০০-প্রাচীন বরফে পরিমাপের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর পরিমান জানা যায় প্রায় ২৯০ পিপিএম (অংশ/মিলিয়ন)।

১৮৭০-বিশ্বের গড় তাপমাত্রা (১৮৫০-১৮৯০) প্রায় ১৩.৭ ডিগ্রী সেঃ।

১৮৭০-১৯১০ দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব। সার, অন্যান্য রাসায়নিক বিদ্যুৎ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭০-প্রথম ধরণী দিবস। পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

১৯৭২-আফ্রিকা, ইউক্রেন ও ভারতে দূর্ভিক্ষ হয় যা বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট তৈরী করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

১৯৭৬-ভবিষ্যৎ জলবায়ুর প্রধান কারণ হিসেবে বন ধ্বংস এবং অন্যান্য পরিবেশ এর পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৮৭-ভিয়েনা সম্মেলনের মন্ট্রিল প্রোটোকলের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিকভাবে ওজন ধ্বংসকারী গ্যাস নির্গমনের বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।

১৯৮৮-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রেকর্ড ধারণকারী তাপ ও খরার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার পায়।

১৯৯০-বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির ধরণ একই রকম হতে পারে বলে প্রথম IPCC রিপোর্টে তথ্য প্রকাশিত হয়।

১৯৯২-রিও ডি জেনেরিও সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জাতিসংঘ কনভেনশন গঠন প্রণালী তৈরী করা হয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবটি প্রতিরোধ করে।

১৯৯৫-দ্বিতীয় IPCC রিপোর্টে মানুষের কারনে সৃষ্ট গ্রীন হাউজ এর মাধ্যমে উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়টি "Signature" হিসেবে প্রকাশিত হয়। যার ফলে আসন্ন শতাব্দীতে মারাত্মক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। রিপোর্ট মতে এন্টার্টিকার বরফের স্তর গলা এবং মেরু অঞ্চলের বর্তমান সময়ের প্রকৃত উষ্ণতার চিত্র জনসাধারণের জন্য হুমকীর স্বরুপ।

১৯৯৭-আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে কিয়োটো প্রোটোকল তৈরী হয়। যার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশসমূহকে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমান কমানোর লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনে দেশসমূহকে

একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার প্রস্তাব ও তুলে ধরা হয় (যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট আগেই তা বর্জন করে)।

১৯৯৮-"Super El Nino" বিগত বছরের সাথে তুলনা করে এই বছরকে মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণ ঘোষণা করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ২০১৪ পর্যন্ত অতিক্রম করেনি। Borehole তথ্য মাত্রারিক্ত উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়টি সমর্থন করেছে।

২০০৫-হ্যারিকেন ক্যাটরিনা এবং অন্যান্য বড় গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়সমূহ ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করে।

২০০৭-উষ্ণতার মারাত্নক ক্ষতিকর প্রভাব যে সহজবোধ্য তা চতুর্থ IPCC রিপোর্টের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ক্ষতি হবে বা গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর খরচের তুলনায় অনেক অনেক বেশী।

২০১৫-প্যারিস চুক্তিঃ প্রায় সকল দেশসমূহ নিজ নিজ দেশে গ্রীন হাউজ গ্যাস কমানোর লক্ষ্যে একশত পোষণ করে এবং তার অগ্রগতির তথ্য প্রকাশ করবে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১৪.৭ ডিগ্রী সেঃ যা শতবছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সইড (CO_2) এর পরিমান ৪০০ পিপিএম এ পৌঁছেছে যা লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে সর্বাধিক।

২০১৬- COP22: জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন মারাকেশ-প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতা

বৈশ্বিক উষ্ণতা হল পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এটা প্রায়শ এমন যে, উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান কারন গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাব যেমনঃ কয়লা, গ্যাস এবং তেল পোড়ানো বা বন ধ্বংসের ফলে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সইড যা পৃথিবী থেকে তাপ বাহিরে যেতে দেয় না বরং আটকে রাখে।

নাসার তথ্য মতে ২০১৬ সালের প্রথম অর্ধেকাংশের মধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের দুইটি অনুসূচক অসংখ্য রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। ২০১৬ সালের প্রথমার্ধে ছয় মাসের প্রতিটি মাসই ধারাবাহিকভাবে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশী উষ্ণতার রেকর্ড করেছে। ১৯৭৯ সালের পর থেকে গত ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ মাসে উত্তর মেরু সাগরে সবচেয়ে কম বরফ সীমার রেকর্ড হয়েছে।

গ্রীন হাউজের প্রভাব

গ্রীন হাউজের প্রভাব একটি প্রাকৃতিক বিষয় যা পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানবসৃষ্ট কার্যক্রম যেমন বায়ু দূষণ এবং বনভূমি ধ্বংসের কারনে বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্যাস বায়ুমন্ডল থেকে চলে যেতে পারে না যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

ওজন-স্তর ধ্বংস

প্রাকৃতিক ভাবে ওজন গ্যাস দিয়ে তৈরী ওজন স্তরটি ভূ-পৃষ্ট থেকে ১৫-৩০ কিঃ মিঃ উপরে অবস্থিত যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি-ডি এর ক্ষতি থেকে রক্ষায় ছাদ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই ওজন স্তরটি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অতিমাত্রায় ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFCs), হাইড্রো-ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (HCFs) এবং রাসায়নিক উদবায়ী যৌগ নির্গমনের ফলে যার মধ্যে ক্লোরিণ এবং ব্রোমিণ বিদ্যমান। এই ধরনের স্তর ক্ষয়ের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি-ডি আসলে যার ফলে মানুষ ও প্রাণীর চামড়ায় ক্যান্সার ও বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটছে। একটি ক্লোরিণ পরমাণু ১০০০০০ এর বেশী ওজন অণু ধ্বংস করতে পারে।

বন ধ্বংস

বন ধ্বংসের একটি গুরুত্বপূর্ন কারন হল বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন। বৃদ্ধির জন্য গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। এটা কার্বনে রুপান্তরিত হয় এবং উদ্ভিদের শাখা, পাতা, কান্ড, মূল এবং

মাটিতে জমা থাকে। অনেক বিশাল এলাকার বন ধ্বংসের ফলে এবং পুনরায় গাছ না লাগানোর ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের তারতম্য হয়। বন ধ্বংসের কারণ; মূলত প্রতি বছর বনের গাছ কেটে ফেলা এবং বনে আগুন লাগানোর ফলে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ১.৬ ডিগ্রি সেঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিমাণটা হয়ত খুব বেশী মনে নাও হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে ছোট ছোট পরিবর্তনসমূহ গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে যার ফলে প্রভাব পড়বে বরফ গলতে, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ও তুষারের পরিমাণ বৃদ্ধি, বন্যা ও খরা বৃদ্ধি, রোগ বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের উপর।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি কৃষির ক্ষতিকারক পতঙ্গ, রোগ এবং রোগের জীবাণু বহনকারীর জন্য সহায়ক। ডেঙ্গু জর এক সময় গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় ব্যাপক হারে বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান।

জিকা ভাইরাস গরম আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায় কারণ:

(১) গরমে মশার ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়
(২) উষ্ণ বাতাসে ভাইরাস দ্রুত বৃদ্ধি পায়
(৩) নতুন এলাকায় বিস্তার লাভ করে

হিমবাহ গলা

পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মিষ্টি পানি হিমবাহে জমা আছে। শুষ্ক মৌসুমের সময় যা প্রায়ই মানুষ ও জীববৈচিত্র্যকে ব্যবহার ও পানযোগ্য পানি সরবরাহ করে থাকে। হিমবাহ থেকে বরফ গলা পানি সমুদ্রে গিয়ে জমা হয় যা শুধু সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধিই করে না বরং লোনা পানিকে নিচের দিকে ধাবিত করে যার ফলে মহাসাগরে জলস্রোত এর পরিবর্তন হচ্ছে। হিমালয়ের হিমবাহ বিশ্বের অন্য যে কোন অংশের তুলনায় দ্রুত অপসৃত হচ্ছে এবং বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যে এগুলো অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিশ্ব যেভাবে উষ্ণ হয়ে উঠছে বর্তমান সময়ে তাতে আরও দ্রুত তা ঘটতে পারে যার ফলে বন্যার ঝুঁকি বাড়বে যা দরিদ্র এবং উচ্চ জনবসতিপূর্ণ উপকূল এবং নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। হিমবাহের বরফ গলা প্রাথমিক ভাবে বন্যার ঝুঁকি বাড়াবে এবং পরবর্তীতে পানির সংকট সৃষ্টি করবে যা ভারতীয় উপ-মহাদেশে বসবাসকারী বিশ্বের জনসংখ্যার ১/৬ অংশের জন্য হুমকির কারণ হবে।

জীববেচিত্র্য

প্রজাতিসমূহ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিসীমার মধ্যে জীবন ধারণে অভ্যস্থ কিন্তু যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ঐ প্রজাতিসমূহ নতুন তাপমাত্রায় অভ্যস্থ হতে পারে না, তাদের জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়ে। IPCC এর ১৫তম পর্যালোচনা রিপোর্ট মতে, স্থল, সমুদ্র ও মিষ্টি পানির একটি বিশাল সংখ্যক প্রজাতি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য হুমকির সম্মুক্ষীণ। নূন্যতম এলাকায় অক্সিজেন বৃদ্ধির কারণে দিন দিন মাছের অভ্যাস সংঙ্কুচিত হচ্ছে এবং যে এলাকায় কোন অক্সিজেন নেই তাকে "মৃত এলাকা বা অঞ্চল" বলা হয়।

- প্রতি ২০ মিনিটে বিশ্বে ৩৫০০ জন মানুষ বাড়ছে এবং ১০ টির বেশী প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে।
- প্রতি বছর ২৭০০০ প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে।
- প্রতি ৬০ মিনিটে ২৪০ একর প্রাকৃতিক ভূমি বিনষ্ট হচ্ছে।
- যদি বিশ্বের তাপমাত্রা ৩.৫ ডিগ্রি সেঃ এর অধিক বৃদ্ধি পায় তাহলে পৃথিবীর জ্ঞাত প্রজাতিসমূহের ৭০% বিলুপ্তির মুখে পড়বে।
- কৃষিজাত ফসলের ৭০% এর বংশানুগতিক বৈচিত্র্য হারিয়ে গিয়েছে।

- বিশ্বের ২০% প্রজাতি ৩০ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
- জীববৈচিত্র্যের ৮০% অবক্ষয় হয় আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে।
- ৭০% বিশ্বের মাৎস্য পুরোপুরি অথবা অতিমাত্রায় আহরণ করা হয়েছে।
- যদি বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ২.৫ ডিগ্রি সেঃ বৃদ্ধি পায় তাহলে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রজাতির প্রায় ২০-৩০% বিলুপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

ভূ-গর্ভের পানির স্বল্পতা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের চাহিদা এবং দীর্ঘ খরার কারণে চাষাবাদের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি পাথর ও মাটির ভিতর দিয়ে ক্ষরিত হয়ে ভূ-গর্ভে গিয়ে জমা হয়। অতিরিক্ত ব্যবহার এবং দূষণের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির সঙ্কট বৃদ্ধি পেয়েছে। গভীর টিউবওয়েল, অগভীর টিউবওয়েল, ছোট কূপ এবং সেচ কূপের জন্য সবচেয়ে বেশী ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়। নিরাপদ পানি বা পানযোগ্য পানিতে পরিমাণের চেয়ে বেশী নির্দিষ্ট দূষণকারী পদার্থের উপস্থিতি ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণের প্রধান কারণ। এই পানি পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য হুমকীস্বরুপ।

মহাসমুদ্রের অম্লতা

সমুদ্র জল যখন কার্বন-ডাই-অক্সইড (CO_2) শোষণ করে তখন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং সমুদ্র জলের pH কমে যায়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে "মহাসমুদ্রের অম্লতা" বলা হয়। ধারণামতে মহাসমুদ্রের অম্লতা মহাসমুদ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রজাতিসমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। সালোকসংশ্লেষণকারী শৈবাল এবং সমুদ্রের ঘাসসমূহ মহাসমুদ্রে উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকলে উপকৃত হয় যেমন- তাদের গাছের মত স্থলে বেঁচে থাকার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে গবেষণা থেকে জানা যায় যে অধিক অম্ল পরিবেশ কিছু চূর্ণীভূত প্রজাতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে যেমন সামুদ্রিক ঝিনুক, ভেনাস-ঝিনুক, প্রবাল। যদি খোলসধারী প্রাণীসমূহ বা জীব হুমকিতে থাকে তাহলে সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খল হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

প্যারিস চুক্তি

১৯৫টি দেশ প্যারিস চুক্তি গ্রহণ করেছে।

উদ্দেশ্যঃ বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেঃ থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেঃ এর মধ্যে রাখা যদি সম্ভব হয়।

লক্ষ্যঃ যত দ্রুত সম্ভব গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানো।

মূল্যনীতিঃ উন্নত এবং উন্নয়ণশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করা। নির্গমনের হার হ্রাস করার জন্য উন্নত দেশ সমূহকে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া এবং তা বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান করা। অন্যান্য দেশ সমূহ যাদের এটা করার সামর্থ আছে তারা এই লক্ষ্য অর্জনে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সহযোগীতা করতে পারে।

পদ্ধতিঃ দেশ সমূহকে জাতীয় ভাবে স্থিরকৃত অবদান (INDCs) অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে যা প্রতি ৫ বছর অন্তর সংশোধন হয়। ১ম রিপোর্টটি ২০২৩ সালে উপস্থাপন করতে হবে। উত্তর-দক্ষিণ প্রযুক্তি বিনিময়।

আর্থিক সংশ্লেষণঃ ২০২০ সাল থেকে ধনী দেশসমূহকে অবশ্যই প্রতিবছর কমপক্ষে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দিতে হবে। অর্থের পরিমাণ ২০১৫ সালে পুনঃ বিবেচিত হবে।

নতুন কৌশলঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত ক্ষতিকর প্রভাবে ব্যাহত, কমানো এবং মূল্যায়ন করার জন্য পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যাতে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সমূহকে সহায়তা প্রদান করা যায়।

চুক্তি প্রয়োগঃ ২০২০ সাল নাগাদ যদি ৫৫টি দেশ এই চুক্তি সমর্থন করে ৫৫% গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে।

Formal and Informal Forestry Education in Bangladesh

Md. Shams Uddin
REDD+ Governance Activity Coordinator
UN-REDD Bangladesh National Programme, UNDP, Bangladesh

Introduction

The United Nations General Assembly declared 21 March the International Day of Forests in 2012. From that time, the government of Bangladesh and development organizations celebrate the day in a befitting manner highlighting the importance of each year theme. This year was celebrated the International day of Forests under the theme " Learn to love Forests", and underscored the importance of education at all level in achieving sustainable forest management and biodiversity conservation. In current context the theme of the year was very relevant because deforestation and forest degradation due to lack of awareness and education is the key issue in developing countries like Bangladesh. In such situation, forestry education both, formal and informal only can contribute to sustainable forest management and biodiversity conservation by understanding forests and keeping them healthy for present and future generations.

Context of Forests management in Bangladesh

Forests in Bangladesh are deforested and degraded directly or indirectly by excessive fuel wood collection from forests, illegal harvesting, expansion of agriculture, lack of governance, over population, poverty and encroachment for settlement and other non-forest uses. However, forests are valued for survival of human and other living beings. The government of Bangladesh has recognized the importance of forests that reflected in the 7th Five year plan and other strategic documents of Bangladesh. All forestry related legal documents have emphasized to sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. More importantly, after the Liberation War in 1971, the Government of Bangladesh included a section (18A) in the Constitution which states that the "State will conserve and develop the environment for people and will ensure conservation and security of forests, wildlife, wetlands, biodiversity and natural resources".

Forests in Bangladesh are managed by the Bangladesh Forest Department (BFD) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) excluding unclassed state forests of Chittagong Hill Forests and some patches of forests in Haor areas. Primarily forests in Bangladesh are governed by the forest Act 1927, Wildlife Conservation and Protection Act 2012, Social Forestry Rules

৮৬

2004 (amendment 2011), National Forest Policy 2016 and Protected Areas management Rule 2017.

The government of Bangladesh has become successful in involving people participation in forestry activities especially in social forestry and co-management approach. As recognition, the government of Bangladesh has achieved the Equator prize 2012 and Wangari Mathai award 2012 for co-management activities, Earth Care prize 2012, UN Best award 2012 and Solution Search Award 2013 for community based adaptation to climate change as well as climate award 2012 for rehabilitation of forest land encroachers through social forestry activities.

Formal Forestry education in Bangladesh

Education can only change people attitude towards conservation of forest for present and future generation. In such, both formal and informal education are crucial. Understanding forests and keeping them healthy is vital for present and future generations. Investing in forestry education is equally important that can change the world for better future. Women and men should have equal access to forest education focus on youth. Forestry higher education in Bangladesh started in 1976 through Institute of Forestry (now Institute of Forestry and Environmental Sciences), Chittagong University. The institute provides BSc, MSc, PhD and in service training of BCS cadre officers of Forest Department (FD). After that Forestry and Wood Technology Discipline of Khulna University (FWTKU) and Forestry and Environment Discipline of Shahajalal University of Science and Technology provide higher education in Forestry in 1991 and 1998 respectively.

Moreover, Forest Academy based in Chittagong is playing a vital a role through training in developing skill of FD staffs. The academy providestraining to Master in Forestry (MSc) for BCS (Forest) officers in the rank of Assistant Conservator of Forest (ACF). It also arranges workshop, seminar and orient Range officers and refreshers course for ACF. Forest Department and Training Centre (FDTC) situated at Kaptai mainly deals forest utilization, efficient use of wood, timber collection and develop sustainable technology for forest management. Nevertheless, three Forestry Science and Technology Institute in Bangladesh, located at Chittagong, Rajshahi and Sylhet provide 4 years diploma in forestry. Education and training wing of FD arranges education and training for FD officials in home and abroad. The wing acts for capacity building and skill development for FD staffs.

Informal forestry education in Bangladesh

Informal forestry education is very important in the socio-economic context of Bangladesh. General people are not recognized fully the importance of forests due to lack of awareness on forests and lack of education.

Informal education should focus on outreach and conservation awareness that would target and engage rural populations living in and around forests to build positive attitudes and behavior to reduce threats to forests biodiversity. Awareness initiatives use a variety of media directed at community leaders, forest resource users, students and government partners. It creates the opportunity to engage a diversity of stakeholders in jointly improving the understanding of the importance of forests and its biodiversity, develop positive attitudes for conservation and initiate action towards sustainable solutions for forests conservation. Government and non-government organizations have successfully engaged in outreach and conservation initiatives includingtree plantation campaigns, celebrating globally recognized biodiversity days (e.g., World Environment Day, World Forest Day, World Wildlife Day), organizing conservation awareness campaigns in schools, supporting interactive popular theatre (drama, songs), sponsoring forest visit programs for journalists, youth, studentsand writing and publishing biodiversity related stories targeting radio, newspapers and television (TV).

Example of some Informal Forestry Education in Bangladesh

Jatra (Bangladesh Folklore): This is known as the most popular form of Bengali folk theatre. With a group of performers, some specific concepts and messages on biodiversity and conservation will be provided and guided so that they can develop in a variety of performances or shows focus on halting deforestation and forest degradation and perform to deliver such messages to the target audience.

Baul (Music/Folk Songs of Bangladesh): With assistance from local communities, serval folk songs could be composed on forestry issues. The lyrics should be consulted and tested with the target communities with support from the FD. The songs need to include some real life of local people living in and around forests. These can be about forest protection, livelihood of local community, benefits of forests, impacts and concerns of local people towards forests degradation and deforestation, etc. The songs could be later sung/performed together at the performance events, etc.

Puppet Theatre: The puppet show is to deliver key messages of forest protection according to some identified topics of forests and forestry. A puppet team will

work closely with the selected NGO in consultation with the FD to develop stories to perform.

Bhatiali Concert: Bhatilia (a form of folk music known as river song) could be also used to engage in raising awareness on forestry. NGOs could possibly work with any potential local Bhatilia band/performance group to compose songs on forests to deliver the messages of biodiversity, wildlife and conservation.

Documentary: Video documentaries will help to promote the visibility of forests activities and can be disseminated broadly. These may be used in television and on the website.

Interactive Popular Theater: Established Interactive Popular Theater (IPT) groups perform message driven shows in different forests. This has been a very successful method of message dissemination.

Social Media for Forestry Awareness Creation

The use of social media such as Facebook, YouTube, Twitter, Instagram for scaling outreach is very important nowadays. Through social media easily can be reached with forestry issues to a wider audience including policy makers and forest managers. Experience around the world suggests that it may become a powerful tool here in Bangladesh as well to disseminate and educate forestry issues

Website

Bangladesh Forest Department (BFD) is maintaining a website to disseminate technical and forest management issues. Moreover, the Nishorgo Network website serves as a repository for documents and a tool for disseminating information. A comprehensive review of the website will be necessary after determining the identity and goals of the national network.

Conclusion

Both formal and informal education is important in forestry to halt or reduce deforestation and forest degradation in Bangladesh. Awareness and engagement of different key ministries including ministry of Land, Agriculture, Finance, Road Transport and Bridges, Railways, Water Resources, Power, Energy & Mineral Resources, Industry, Defense, Chittagong Hill Tracts Affairs are important to reduce and halt deforestation and forest degradation in Bangladesh. Further, Department of Environment (DOE), Survey of Bangladesh, SPARSO, Land Record and Survey Department, CHT Regional Council and universities and research institutes are important and have significant role to conserve forest in Bangladesh.

In light with the local and global issues, syllabus for graduate and undergraduate including forest school should update periodically through incorporating current global issues of forest management including climate change, valuation of ecosystem services of forests, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), carbon financing, collaborative management, green economy, blue economy, adaptation and mitigation. Private sectors in Bangladesh still are not fully aware about the forestry based enterprises. Currently private sector is getting important to engage them in forestry activities. They should engage in forest management activities.

To achieve sustainable conservation of biodiversity, a program that integrates outreach and awareness programs into mainstream forests management is needed. Outreach and conservation awareness would target and engage rural populations living in and around forests to build positive attitudes and behavior to reduce threats to biodiversity. This strongly supports the importance of establishing a unit within the Headquarter of Forest Department with funding for adequate manpower.

At forest Division level, outreach and advocacy working groups would be the established. The working groups will composed of DFOs/ACFs, District Cultural Officer, the Education Officer and the Cultural Group representative. The working group would be tasked with reaching a consensus on the priority threats for their specific protected areas and designing effective outreach and conservation awareness activities that target key stakeholders in the PA to include students, women, youth, religious leaders, local elites, potential political leaders, business associations, clubs, social issue associations, community members and local journalists. Importantly, such outreach and conservation awareness programs must be coordinated with local government departments, civil society and non-government organizations (NGOs) to raise awareness of and support for wildlife and forest management rules and acts.

৯০

Dhaka Forest Division: Towards Participatory Sustainable Forest Management

Mohammad Yousuf
Divisional Forest Officer, Dhaka Forest Division

Sustainable Forest Management (SFM) is not only a system, rather it is the process of managing permanent forest land to achieve one or more clearly defined objectives of management with regard to the production of a continuous flow of desired forest products and services without undue reduction of its inherent values and future productivity and without undue undesirable effects on the physical and social environment. When active and spontaneous participation of local people can be ensured in sustainable management of the forests we can term it as participatory sustainable forest management (PSFM). Participation can be defined in terms of who participates, in what activity, how, and at what level of empowerment. Dhaka Forest Division progresses towards participatory sustainable forest management (PSFM) with the active participation of local community in the operation of successful social forestry practices and sal coppice management.

There are eight value orientations of the SFM paradigm. These are:

- Sustained productivity
- Social equity and social justice
- Ecosystems integrity
- Environmental quality or security
- Systemic or holistic orientation
- Participatory, proactive, and anticipatory
- Interdependence
- Empathy

Dhaka Forest Division with the active participation of social forestry participants and local people not only protects huge amount of forest lands, manages forest resources, conserves wildlife and biodiversity, however it contributes a lot in environmental protection, climate change adaptation and mitigation, soil and water conservation, watershed management, enhancing terrestrial carbon sequestration, combating global warming, providing sustained ecosystem services along with direct benefit of employment generation, poverty alleviation, socio-economic upliftment and government revenue earning. Social forestry practices in Dhaka Forest Division helps in maintaining gender balance, social

equity and justice, infrastructural development of the society and in leadership development and empowering women and poor of the society.

Social forestry practices of woodlot plantation, agro-forestry, strip plantation, associate undergrowth crop of cane and bamboo plantation, sal coppice management, etc started here in the year 1987-88 involving local poor as participants. Till now a total of 5151.0 ha of woodlot (new) involving 5943 nos. of participants and 1674.20 ha of agro-forestry plantation involving 1010 nos. of participants has been established in the barren/encroached/degraded forest area. Some 2085.0 ha of disturbed/degraded forest area has been managed under sal coppice management involving 2092 nos. of participants. Furthermore, some 70.0 km of strip plantation has been raised in the side of road, rail and embankment involving some 350 nos. of local participants outside the forest area. In addition, some more forest area has been covered with bamboo and cane plantation as associate undergrowth with the active participation of local poor. Dhaka Forest Division with the successful implementation of social forestry practices has now come up with its 3rd rotational plantation of 2162.64 ha woodlot plantation involving 4977 nos. of participants and 95.8 ha agro-forestry plantation involving 96 nos. of participants. Some 3547.28 ha of 2nd rotation woodlot plantation involving 11711 participants and 741.31 ha agro-forestry plantation involving 666 participants has been carried out.

As per the provision of participants benefit sharing agreement (PBSA), mature forest crops are being sold ten years interval ensuring distribution of benefits among social forestry participants. Already taka 3866.05 lakh of the share of social forestry benefit has been distributed among a total 2439 nos. of participants of them 1952 are male and 487 are female. Social forestry benefit has been distributed in four upazilas of Gajipur district: Gajipur Sadar -140.11 lakh taka, Kaliakoir- 3164.10 lakh taka, Sreepur- 447.07 lakh taka and Kapasia-111.33 lakh taka.The same amount of money from rotation mature social forests sale proceeds has been remitted in the treasury as government revenue. In addition to having final benefits, social forestry participants used to get regular intermediate benefits from plantations. They grow suitable agricultural crops in the gaps of planted saplings in the initial stage of plantations. They are also benefited by pruning and thinning products and by fruits, medicines, fuel they collect. More people are now interested to be involved in social forestry. But there is a serious crisis of forest lands in Dhaka Forest Division for extension of social forestry in newer areas to accommodate more people as participants. Other than some 11,500 acres of encroached forest land, most parts of remaining

about 43,000 acres of forest lands of Dhaka Forest Division are green covered by natural sal forests and social forestry plantations.

Ten percent of the sale proceeds of rotation mature social forestry plantations are being kept as Tree Farming Farm (TFF) fund which incur the expenses of 2nd, 3rd and subsequent rotational social forestry plantation activities including nursery raising, maintenance and plantation maintenance as and when needed. No government budget/expenditure is required in the establishment and maintenance of any such 2nd, 3rd or subsequent rotational social forestry plantations. Surplus Tree Farming Farm (TFF) fund can be utilized in any co-operative forestry activities or social developmental activities. Society people are now much inspired and motivated then before in the development and conservation of forests by the massive successes of social forestry practices in the area.

Conservation of natural sal forests also gets momentum by sal coppice management practiced in Dhaka Forest Division by the active participation of local poor. Participants under the guidance of forest department officials conserve natural sal forests by guarding younger sal coppice shoots and regenerations against grazing, incidental and intentional fires, burning of vegetation for the use of fuel, illegal logging, and conversion of forest lands into non-forestry uses, excavation of forest soils and against encroachment of forest lands. Thus they do help not only in conservation of sal regenerations; but also in promotion of other sal associates to come up. They do this for the greater benefit of receiving continuous supply of minor forest products and for sustained ecosystem services. Thus, degraded, disturbed, denuded and fragmented sal forests are now managed as ecosystem approach by community participation allowing expansion and withstand of natural indigenous mixed forest crops that helps carbon sequestration, minimize environmental pollution by ameliorating air, water and soil contamination, combat green-house effect, mitigates climate change effects, and promotes wildlife and biodiversity conservation. This participatory ecosystem approach of forest management helps in watershed management by the way of soil and water conservation which provides fresh water supply for household, agricultural and industrial uses, promotes ecotourism in the area supporting livelihood of the local people and thus contributes to the national economy a lot.

The participants of social forestry plantation programs and of sal coppice management form groups and work together in nursery raising, taking care and maintenance of the nursery, plantation establishment, maintenance, tending,

looking after and protecting from grazing, illicit felling, thinning and in harvesting. They have a general committee consisting of all the members of a particular plantation and from that committee they form a social forestry management committee of 9 members and within the social forestry management committee they form a Tree Farming Farm (TFF) fund management committee of 3 members. They sit regularly in the meetings and after critical discussion of any forestry matters they take unanimous decisions and resolve jointly any forestry issues and problems. They do all these social forestry works under the constant guidance of forest officials. In cases of any conflicts arises among the participants, there is a grievance redress committee to address the issues. Within the group the individual participants are interdependent, cooperative, sympathetic and empathetic to each other and work as one family.

As the social forestry participant groups and sal coppice management groups are selected from poor and disadvantage people of the society, the forest benefits primarily directly goes to them making them financially solvent. Leadership is developed among poor and women and they are gradually being empowered in the society. The poorer group in the society is privileged to become rich and existing gap between poor and rich minimizes ensuring social equity and justice that ultimately brings social peace and harmony.

With the above discussion it is clear that Dhaka Forest Division progresses positively towards participatory sustainable forest management (PSFM) by attaining all the eight value orientations of the SFM paradigm.

পেঁচার যত মুখ

নিগার সুলতানা
বন্যপ্রাণী পরিদর্শক, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ,ঢাকা।

পেঁচার অদ্ভুত রকমের ডাক এবং নিশাচর স্বভাবের কারণে একে নানান কুসংস্কার এবং অলৌকিক চিন্তার সাথে যুক্ত করা হয়। প্রচলিত আছে , মন খারাপ করা মুখকে "পেঁচার মত মুখ" বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে পেঁচা একটি উপকারী পাখি। এর গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

১. পরিবেশের খাদ্য শৃঙ্খলে পেঁচা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
২. প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে।
৩. পেঁচা স্তন্যপায়ী ও পাখি শিকার করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।
৪. পেঁচা বাঁচার জন্য প্রতিদিন ৫-৭ টি ইঁদুর খেয়ে থাকে ফলে আমাদের ক্ষেতে-খামারে,ধানের গোলায়, ঘরে-বাইরে অর্থনৈতিক ভাবে খুবই উপকার করে।
৫. গাছের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে গাছকে রক্ষা করে।
৬. পেঁচা ময়লা-আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ সুরক্ষা করে।
৭. অন্ধকারে শব্দ শুনে কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী শিকার করে।
৮. উদ্ভিদের পরাগায়ণ, বীজের বিস্তার ও অঙ্কুরোদগমের মাধ্যম হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৯. পাখিকে কেন্দ্র করে চিত্তবিনোদন ইকোট্যুরিজম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পালন করছে।
১০. ধর্মীয় ও নান্দনিক দৃষ্টিকোন থেকেও পেঁচার গুরুত্ব অপরিসীম।

পেঁচা পাখি শ্রেণীর স্ট্রিজিফরমিস গোত্রের অর্ন্তভুক্ত। বাংলাদেশে ১৭ প্রজাতির পেঁচা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৫ টি স্থায়ী ও ২টি পরিযায়ী। এখানে কয়েকটি প্রজাতির বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

১. লক্ষী পেঁচা (Common Barn Owl)
বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Tyto alba*
আকারে কবুতরের মতো; ৩৬সে. মি.; হালকা সোনালী পিঠ এবং সাদাটে পেট। সাদা পান পাতার মতো মুখমন্ডল। পিছন দিক থেকে দেখতে ঘাড়, পিঠ ও লেজ সোনালি হলুদ। বুক, পেট ও লেজে অসংখ্য সরু দাগ। মেটে সাদা থেকে মেটে বাদামী চঞ্চু। চোখ কালো। পা হালকা মেটে ও আঙুল কালচে। সাপের মতো হিসহিস শব্দ করে ডাকে। সারা দেশে আছে; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ লক্ষী পেঁচা

২. খয়রা-শিকরে পেঁচা (Brown Boobook)
বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Ninox scutulata*
আকারে কাকের মতো; ৩২ সে. মি.; কালচে মাথা। পিছন দিক থেকে দেখতে কালচে ঘাড়, মসৃন সোনালি ডানা ও লেজ সোনালি-বাদামি ব্যান্ড। সাদাটে পালকে ঢাকা পা এবং আঙুল হলুদ। সুরেলা ডাক; 'হুয়াপ ... হুয়াপ'। সারা দেশে আছে; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ খয়রা-শিকরে পেঁচা

৩. দাগি ঘাড় -কুটি পেঁচা (Collared Owlet)
বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Glaucidium brodiei*
আকারে চড়ুইয়ের মতো; ১৭ সে. মি.; সোনালী- হলুদ দেহ। সারা দেহে আড়াআড়ি সাদাটে লাইন। পিছন দিক থেকে দেখলে ধূসর-বাদামি মাথায় কালচে নকশা যা পেঁচার চোখ ও মুখের মতো মনে হয়। ঘাড়ে লালচে লাইন চোখে পড়ে এবং হলদে চঞ্চু। চোখের পাশে দুসারি দাগ এবং চোখ উজ্জ্বল হলুদ। বুক বাদামি ও পেট সাদা। ফিকে সবুজে-হলদে পালকে ঢাকা পা এবং হলদে আঙুল। সুরেলা ডাক; 'পুপ-পাপুপ-পুপ '। চট্রগ্রামের পাহাড়ি চির সবুজ বনে আছে; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ দাগি ঘাড় -কুটি পেঁচা

৪. এশীয়-দাগী পেঁচা (Asian Barred Owlet)
বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Glauvidium cuculoides*
আকারে শালিকের মতো; ২৩ সে. মি.; কালচে বাদামি দেহ। সারা দেহে আড়াআড়ি সাদাটে লাইন। বাদামি বুক ও সাদাটে পেট। চোখেল পাশে অনেক সরু দাগ। চঞ্চু হলদে সবুজ। চোখ লেবু হলুদ। ফিকে জলপাই-হলুদ পালকে ঢাকা পা। দেহ কাঁপিয়ে ডাকে: 'ট্ররররররর' এবং জোড়ে ডাকে 'উওউওউও'। চট্রগ্রাম,ঢাকা ও সিলেট চিরসবুজ বন ও চা বাগানে আছে ; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ এশীয়-দাগী পেঁচা

৫. খুড়ুলে পেঁচা (Spotted Owlet)
বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Athene brama*
আকারে শালিকের মতো; ২১ সে. মি.; সরা দেহে সাদাটে ফুটকি। প্রশস্ত সাদাটে ভ্রু-রেখা ও গলাবন্ধ। সাদাটে বুক ও বাদামি দাগ পেটে। মাথার বাদামি চাঁদিতে সাদা তিল। চোখ সোনালি-হলুদ। চঞ্চু সবুজে। ফিকে হলদে-সবুজ পালকে ঢাকা পা। জোরালো, কর্কশ ডাক: 'চীভক, চীভক, চীভক, চীভক'। সারা দেশে আছে; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ খুড়ুলে পেঁচা

৬. কণ্ঠী নিম পেঁচা (Collared Scops Owl)
বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Otus lettia*
আকারে শালিকের মতো; ২৩-২৫ সে. মি.; কালচে বাদামি দেহ। ফিকে গালে কালো রেখা। লম্বা ধূসর কান-ঝুটি। ঘাড়ে কালচে বাদামি লাইন এবং হলুদ পট্টি। ডানায় হলদে তিলা। দেহের নিচের দিক হলদেটে এবং শেষ প্রান্তে কালো দাগ ও তিলা। উপরের চঞ্চু সবুজাভ এবং নিচের চঞ্চু কালচে। চোখ বাদামি। ধূসর পালকে ঢাকা পা। সারা-রাত থেকে থেকে ডাকে 'টুও' বা 'নিম'। সারা দেশে আছে; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ কণ্ঠী নিম পেঁচা

৭. পাহাড়ি- নিম পেঁচা (Mountain Scops Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Otus spilocephalus*

আকারে শালিকের মতো; ২০ সে. মি.; মরচে বর্ণের দেহ। পিঠে হলুদ ও বাদামি বর্ণের ছাপ; দেহের নিচের দিক বাদামি। কালচে-বাদামি বুক ও তলপেট সূক্ষ্ম দাগ। দাগি মাথা। ভোঁতা কান-ঝুটি। চোখ সোনালি হলুদ। চঞ্চু মোম-হলুদ বা মেটে। হালকা বাদামি পালকে পা ঢাকা। মোলায়েম ডাক: 'পুপ-পুপ'। চট্টগ্রাম পাহাড়ি চিরসবুজ বনে আছে; খুব কম দেখা মেলে।

চিত্র ঃ পাহাড়ি- নিম পেঁচা

৮. উদয়ী-নিম পেঁচা (Oriental Scops Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Otus sunia*

আকারে শালিকের ছোট; ১৯ সে. মি.; দেহের বর্ণ বার বার বদলে ধূসর, বাদামি ও লালচে হয়। মাঝারি কান-ঝুটি। ডানায় খাড়া এক সারি সাদাটে ছোপ। ফিকে পেটে সরু সরু কালচে লাইন। চঞ্চু সবুজ বা হলুদে। চোখ ফিকে হলুদ কিংবা কালচে বাদামি। কালচে পালকে পা ঢাকা। কোমল শব্দের ডাক: 'উক-কুক-কেরুক'। সারা দেশে আছে; মাঝে মাঝে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ উদয়ী-নিম পেঁচা

৯. ছোট কান-নিম পেঁচা (Short Eared Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Asio flammeus*

আকারে কাকের মতো; ৩৭-৩৯ সে. মি.; কালচে ছোপ দেয়া সোনালি দেহ। বড় গোলাকার মুখ। চোখ হলুদ; চোখের পাশে কালচে; ভ্রু সাদা। খুব ছোট কান-ঝুঁটি। সোনালি ডানায় চার সারি কালো লাইন। লেজেও চার সারি কালো লাইন। চঞ্চু মেটে। সোনালি পালকে ঢাকা পা ও আঙুল। পরিযায়ী ও দিবাচর। প্রধানত ছোট ছোট পাখি শিকার করে। শীতে সারা দেশের নদী তীরে ও ঘাসের প্রান্তরে আছে; মাঝে মাঝে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ ছোট কান-নিম পেঁচা

১০. খয়রা-গাছ পেঁচা (Brown Wood Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Strix leptogrammica*

আকারে চিলের ছোট; ৪৭-৫৩ সে. মি.; কালচে বাদামি দেহ। চ্যাপ্টা গাল-চাকতি কালচে। স্পষ্ট সাদা ভ্রু। চোখের চারিদিকে কালো ছোপ ওপর দিকে বাঁকানো। ডানায় সারি সারি সাদাটে দাগ। মাথার চাঁদি, ঘাড় ও ডানা-ঢাকনি বাদামি। ডানা-ঢাকনিতে খাড়া সাদাটে লাইন। সাদাটে বুকে মোটা বাদামি লাইন। পেট হালকা হলুদ। সোনালি পালকে ঢাকা পা ও আঙুল। চঞ্চু সবুজ; বড় ও স্পষ্ট নাকের ছিদ্র। চোখ কালচে বাদামি। নিচু কণ্ঠে ডাকে:'টু-হুও'। ঢাকা, সিলেট, খুলনা বনে আছে; খুব কম দেখা মেলে।

চিত্র ঃ খয়রা-গাছ পেঁচা

১১. তিতিপেট-হুতোম পেঁচা (Spot-bellied Eagle Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Bubo nipalensis*

আকারে চিলের মতো; ৬৩ সে. মি.; কালচে দেহ। কালচে পিঠ ও ডানায় কালো তীর চিহ্ন। ডানার প্রান্তে সারি সারি কালো লাইন। হলদে পেটে সারি দেয়া কালচে তীর চিহ্ন। গোলাকার গাল-চাকতি। ডোরাকাটা, বিশাল, খাড়া ও চোখা কান-ঝুঁটি। চোখ বাদামি। চঞ্চু হালকা মোম-হলুদ; বড় ও স্পষ্ট নাকের ছিদ্র। সাদাটে পালকে ঢাকা পা। কাতর স্বরে কান্নার মতো ডাক। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ও সিলেটের চিরসবুজ বনে আছে; খুব কম দেখা মেলে।

চিত্র ঃ তিতিপেট-হুতোম পেঁচা

১২. মেটে-হুতোম পেঁচা (Dusky Eagle Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Bubo coromandus*

আকারে চিলের মতো; ৫৮ সে. মি.; চোখা, খাড়া, একরঙা ও কিছুটা ছোট কান-ঝুঁটি। ধূসর-বাদামি পিঠে কালচে ছোপ। ডানার প্রান্তে সারি সারি কালো লাইন। ধূসর পেটে সরু ছিটা দাগ। চোখ ফিকে-হলুদ; চঞ্চু ইস্পাত বর্ণ; বড় ও স্পষ্ট নাকের ছিদ্র। ফিকে-বাদামি পালকে ঢাকা পা ও আঙুল। গম্ভীর স্বরে ডাকে: 'ও ও ও ও ও ও ও-ও-ওওওওওউও'। সুন্দরবন, চিরসবুজ ও পাতাঝরা বনে আছে; খুব কম দেখা মেলে।

চিত্র ঃ মেটে-হুতোম পেঁচা

১৩. খয়রা-মেছো পেঁচা (Brown Fish Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Ketupa zeylonensis*

আকারে চিলের মতো; ৫৬সে. মি.; হালকা খয়েরি দেহ। সমান্তরাল ও ভোঁতা কান-ঝুঁটি। মাথার চাঁদি, কাঁধ-ঢাকনি ও ডানা-ঢাকনি অতি সরু কালচে বাদামি দাগ। কপালে সরু সাদাটে লাইন। খয়েরি পিঠে কালচে ছোপ। ডানার প্রান্তে সারি সারি কালো লাইন। হালকা খয়েরি পেটে সরু ছিটা-দাগ। চোখ হলদে। চঞ্চু ধূসর। পালকহীন কালচে পা ও আঙুল। গভীর ও ফাঁপা কণ্ঠে ডাকে: 'বু-বুম'...। সারা দেশে আছে; সহজে দেখা মেলে।

চিত্র ঃ খয়রা-মেছো পেঁচা

১. মেটে-মেছো পেঁচা (Buffy Fish Owl)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Ketupa ketupa*

আকারে চিলের মতো; ৫০সে. মি.; খাকি দেহ। সমান্তরাল ও ভোঁতা কান-ঝুঁটি। মাথার চাঁদি, কাঁধ-ঢাকনি ও ডানা-ঢাকনি কালচে বাদামি দাগ। কপালে প্রশস্ত সাদাটে লাইন। খাকি পিঠে কালচে ছোপ। ডানার প্রান্তে সারি সারি কালো লাইন। হালকা খাকি বর্ণের পেটে মোটা ছিটা-দাগ। চোখ উজ্জ্বল হলুদ।চঞ্চু ধূসর। পালকহীন কালচে পা ও আঙুল। ক্রমাগত ডাকে: 'বুপ-বুপ-বুপ'...। সুন্দরবনে আছে; খুব কম দেখা মেলে।

চিত্র ঃ মেটে-মেছো পেঁচা

[ছবি সংগ্রহ- ইন্টার নেট]

URBAN GREENING: A STRATEGY TO ADAPT CLIMATE CHANGE IN URBAN CENTERS

Fatema Sharmin Sonia
Urban Community Architect

Introduction

World is going through the largest wave of urbanization in history through development process of human kind. Researcher says, around 55% world's population live in urban areas in 2018 while during 1930 it was only 30% and by 2050 this number will reach at 68%. This rapid urbanization is accelerating the threats of climate change or global warming. Commonly, urban centers with dense built environment are highly vulnerable to impacts of climate change although 70% of greenhouse gas are emitted by urban centers around the world. According United Nations Environmental Program, only the building sector is the largest contributor to global GHG emission with estimated one third of all global energy end-use taking place within buildings. Additionally, the manipulation of the environmental land surfaces and disruption of natural processes associated with urbanization make urban areas more vulnerable to climate change. Urban centers contain many features which are closely related with climate change impacts. Warmer temperature, urban heat island effect, air and noise pollution, water logging or urban flooding, health hazards due to heat and pollution all are related to climate change which may cause even loss of life and assets to city dwellers. Disruption of green spaces by hard surface causes loss of environment and biodiversity of urban centers which become vulnerable to extreme event of climate change. On the other hand, GHG emission from building sector contributes to global warming and ozone layer damage. While cities with their large concentration of people, infrastructure, and industry are likely to be exposed to greater climate hazards and risks, they also have a strong potential role in climate change adaptation. Regenerating the green space within urban centers and buildings is the most effective natural solution to fight against climate change which known as "Urban Greening". Urban greening is one of the most important method for sustainable urban development, which contributes towards good quality of life and sound environment of the urban dwellers through its numerous functions such as by reducing urban air pollution load and provide purified air, act as heat absorber during the hot summer particularly in the cities of tropical regions, and increases the aesthetic or recreational value and so forth. On the other hand, integrating green infrastructures to urban environment

can be an important contributor to sustainable urban development in terms of improving the quality of life and environment for current urban populations.

What is urban greening

The concept of urban greening is shifting with time. Few years back urban greening meant nothing more than parks and tree-lined streets in city level, but presently it includes a wide variety of innovative landscaping at neighborhood and home level too. Urban greening has been defined as "urban landscaping and forestry that creates mutually beneficial relationship between city dwellers and their environments". In short, installing soft surfaces (grass, trees, shrubs and watershed) at different urban spaces which can impact the micro climate of a city through rain water absorption and evapotranspiration. It refers to all forms of natural and designed vegetation like street trees, open parks and gardens, playground, water plaza, shrubs, community garden, residential garden and new urban technologies like green wall, green roof, rain garden, rain barrels, green street design with permeable pavements and ecosystem restoration that also known as Green Infrastructures (GI). Green infrastructures integrates plants in urban environment.

Objectives of urban greening

The objectives of urban greening are numerous. They improve the lives of urban dwellers and wildlife in urban centers, as well as making cities more eco-friendly and aesthetically beautiful. It also fight against air pollution, neutralize the GHG gases from atmosphere especially CO2, reduces urban heat island effect by cooling environment and reradiating less heat from concrete surfaces. Moreover, urban greening helps combat noise pollution, soaks up rainwater that may otherwise create flooding, strengthen nature of cities through regenerating habitat for local wildlife, calming traffic and lessening urban crime by increasing social cohesion. Urban greening helps to reduce both physical and mental health hazards of city dwellers. It enhances the socio-economic condition of low income people living in urban areas by generating livelihood options through roof top gardening and homestead agriculture development. Urban greening has even commercial value for property. Real estate value increases with green surfaces.

Urban centers and climate change

Climate change is the greatest global challenge of the 21st century as it threatens environment, air, food, water, shelter and security- all basic needs of human life. At the same time, heat related health risks, air pollution and flooding with over

precipitation are increasing day by day as climate change brings warmer temperatures, more extreme weather events and sea level rise. These climatic risks are greatest in urban areas with grey infrastructures or where natural landscape have been disrupted. As urban areas are constantly growing, more people move to cities and industries thrive. To meet this extra demand of housing and supportive services more building and infrastructures are developing rapidly which is contributing to climate change by emitting more CO_2 gas at atmosphere. Result is urban heat island effect , more rain water runoff, urban flooding or water logging, different health hazards, loss of ecosystem through cutting forest and filling wetlands. Urban heat islands are areas within cities with less tree canopies and more concrete surfaces that produce, store and re-radiate heat and also reduce cooling capacity by evapotranspiration.

People who living in urban heat islands are exposed to greater health riskof heat-related illness, specially the low income people as they live in congested areas with less vegetation and have very less capacity for cooling their living areas mechanically.

Urban areas experience greater air pollution and warmer temperature during summer season. Higher temperatures lead to higher levels of ozone, which increases risks for asthma and heart attacks. Warmer temperature can also lead to increases in energy demands, particularly summer time air conditioning, increasing the chance of electricity brown-outs. People living in poverty are less able to afford the costs of air conditioning, placing them at a higher risk for heat-related illnesses. Moreover, grey infrastructures which made of concrete may increase rain water runoff as surface water is unable to be filtered through soil. This contributes to urban flooding during extreme rain events, and increase the concentration of pollutants in run off.

Climate adaptation through urban greening

As climate Change has become a prominent issue in urban areas, so experts like architects, engineers and urban planners are exploring several ways to create sustainable urban living with effective design and planning. Future consequences and sustainability of built forms and climate change are considered to generate design and planning strategies of urban spaces. Urban greening is such an adaptation strategy for buildings and infrastructures in cities which is getting popular globally day by day. Urban greening contribute to reduce heat island effect through temperature reduction and cooling urban spaces. Building surface, pavement and concrete in cities absorb energy from the sun and radiate the energy out, heating the air in cities up to 4 degree Fahrenheit than the surrounding countryside. Urban trees provide shade, preventing pavement and concrete from

heating up and also cool the air by transpiring water . Green roof, façade and wall enhance the cooling process of building by absorbing heat through evapotranspiration and contribute to building thermoregulations. Putting green spaces around buildings acts like shading device and lessen indoor heat which can decrease energy consumption cost by building users up to 20% especially during summer season.

Green infrastructures reduce sewer overflows during storms and recharge groundwater aquifers water by allowing rainwater to soak into the ground. Roadside vegetation in the form of bios-wales can reduce runoff from impervious surfaces which also enhance the soil quality. Green parks can sequester more CO_2 from air and thus purify air quality in urban centers, absorb rain water which increase the soil moisture contamination and replenish groundwater. Rain garden rain barrels, water plaza and Green Street can manage storm water which prevent urban flooding. Plants and vegetative growth can protect fragile coastal urban areas. In Coastal urban centers, vegetation along shorelines can also improve water quality and aquatic habitat.

Urban greening has many direct and indirect health benefits that enhance the quality of life of city dwellers. It has significant contribution to air purification by trapping harmful pollutants such as ozone, nitrogen dioxide, and particulate matter in urban centers, which cause multiple health effects such as eye irritation, airway constriction, asthma and other respiratory diseases. Accessible parks & playground in urban centers have been associated with greater physical activities, mental relaxation, social interaction through neighborhood development and prevent crimes. Street side trees create buffer area to reduce acoustic pollution which lessen the stress of city dwellers and speed up recovery time of patients. It also reduce temperature by providing shade which helps to reduce heat related illness. Urban greening has vital contribution torestoring eco system and habitat for wild life that can combat climate change. Green wall and green roof of buildings can create new habitat for wild life and improves biodiversity. Moreover, increasing green space in urban areas, especially in densely built-up cities is considered to be a valuable adaptation response in climate change as the micro climate of an urban area get influenced by urban greening.

Recommendation

Due to economic reason and climate change effect rural population are migrating to urban areas in Bangladesh which indicates the future expansion of urban centers. Some research shows how many existing green spaces in urban areas are losing day by day through unplanned rapid urbanization. But it is possible to scale

upurban greeningthrough taking proper initiatives of state government as well as city government, private sectors and city dwellers. Conserving existing green spaces like playground, park, garden and water body, urban afforestation program to increase roadside plantation, promoting homestead and rooftop gardening and nursery activities can enhance the area of soft surfaces in urban centers. Addressing new parks, playground, community garden, rain garden and roadside plantations through proper land use planning in extended city areas or new city design can be effective solution to lessen grey areas. Building design with rooftop gardening and vertical gardening should be mandatory through policy generation and implementation. Architects, urban planner, engineers who are engaging with design and planning can incorporate green spaces with built form. Promoting landscape design in city areas will make city greener and aesthetically beautiful. City government can play important role by promoting different laws and policies to preserve existing green spaces and encourage city dwellers for roof top gardening, vertical gardening through compensate tax. Private sectors who are related to land development can develop residential and commercial areas with proper green space for community.

Conclusion

With so many benefits, it's very easy to understand, why cities around the world are pushing to incorporate urban greening into their future buildings and cities. Many developed cities like London, Berlin, Copenhagen are now prioritizing urban greening as the most effective adaptation strategy to climate change. They are planning to incorporate urban greening with building design and as well as city planning to make cities more sustainable and resilient in future. For adapting climate change through sustainable city development there is no alternative of urban greening which can provide not only good quality of life, but also sound environment to the urban dwellers. Preserving existing wetlands, retrofitting existing building and infrastructures with green, more plantation at street side, promoting roof top gardening through free taxation, planting more trees at park, school playground and open spaces can be effective approach for urban greening. Moreover, for new building and infrastructure construction, greening should be mandatorily incorporate through policy generation. For densely urban centers where land is limited vertical gardening can be an effective approach to make city more green, sustainable, eco-friendly and adaptive to climate change.

কবিতা
বৃক্ষ বন্দনা

আসাদ শেখ, অফিস সহকারী, সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাট

বৃক্ষ, তুমি প্রকৃতির হয়ে মিশে আছ
মাটিকে আঁকড়ে ধরে
আমাদের জীবনের সাথে।

তোমার মাঝে কোনো কৃপণতা নেই
নেই অহঙ্কার, নেই সন্ত্রাস।
নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে তিলে তিলে
আমাদের দুঃখের দিনেও তুমি সুখ এনে দাও
দাও সচ্ছলতা অর্থ দিয়ে
দানবীর কোনো মানবের মতো হাত বাড়িয়ে।

তোমার নীরব দান আমরা বুঝি না
তাই, অত্যাচার করি তোমার ওপর
তোমার বংশ উজাড় করে
নতুন নগর গড়ি নিয়ত
তুমি নীরবে সহ্য করো সব।

মানুষের মতো তোমার মুখেও যদি ফুটত কথা
এই দুর্বিনীত মানবের কী হতো দশা
বুঝত অবশেষে।

বৃক্ষ, তোমার পরিচয় শুধু ফলে নয়, ফুলে নয়;
মানুষের রক্তের সাথে, দেহের সাথে
মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন ঘেরা
অনাগত ভবিষ্যতেও।

মানুষকে ভালোবাসলে
ভালোবাসা না ও মিলতে পারে;
তোমাকে আপন করে নিলে
তুমি ছায়া দিয়ে, মায়া দিয়ে, ওষুধ দিয়ে রোগে

মায়ের মতোই অহর্নিশ পাশে থাকো ।
তুমি কাষ্ঠ দিয়ে খাদ্য পাকাও, ক্ষুধা মিটাও পেটের
নিবিড় মিশে থাকো আমাদের খাটের নিদ্রায়
আরাম কেদারায়, লেখা ও পড়ার টেবিলে।

বৃক্ষ, তুমি এইভাবে বেঁচে থাকো ঠিক
তোমার মতোই চিরদিন এ ধরার বুকে।

খাদ্য

মোস্তফা ফেরদৌস হাজরা
হিসাব রক্ষক, এফ এস টি আই, রাজশাহী

আলু ও আটা এবং ঢেঁকিছাটা চালে,
শর্করা শক্তি বেশী থাকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।
দেহ বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণে মাছ মাংস ছানা,
আমিষ প্রধান খাদ্য এসব খাবে ষোলআনা।
তাপ সৃষ্টিতে তিল বাদাম সয়াবিন তেল,
খাবে ঘি ডালডা চর্বি ও নারিকেল।
ভিটামিন এ এর অভাবে হয় রাতকানা,
খেতে হবে গাজর আম কাঠাল রঙিন শাক সবজি ও ছানা।
ভিটামিন বি এর অভাবে রক্ত শূন্যতা দূর্বলতা,
আহারে অরুচি অনিদ্রা করে মাধা ব্যাথা।
হয় হৃদরোগ চোখে দেখে অন্ধকার,
মটর মুগ ফুলকপি শিমের বিচী ভিটামিন বি এর সমাহার।
ভিটামিন সি পাবে লেবু কামরাঙা ও পেয়ারা,
আরো আছে আনারস কাঁচামরিচ টমেটো আমড়া।
ভিটামিন ডি এর অভাবে দাত ও হাড় ক্ষয়,
ভিটামিন ডি আছে ডিম দুধ এবং কলিজায়।
কচুশাক ও কলার মোচা খাবে যে,
পূরণ হবে তার দেহের ভিটামিন কে।
থাইরয়েড ও গলগন্ড আয়োডিনের অভাবে,
পর্যাপ্ত আয়োডিন সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যাবে।
গুড় মিষ্টি মধু এবং মিষ্টি যত ফল,
পরিমিত করলে আহার গায়ে হবে বল।
পুষ্টির অভাবে শরীর যখন হয় নড়বড়,
দেহে হয় আঁচিল বাত ও টিউমার।
খাদ্যের সাথে হয়না খেতে কাঁচা নুন,
বেশী জালে শাক সবজির কমে যায় গুন।
হাইপ্রেসারের জন্য ভালো টক জাতীয় ফল,
পটাশিয়াম পেতে হলে খাবে ডাবের জল।
বহুমুত্র রুগীর বন্ধু টক দধি ও ঘোল,
ভাতের চেয়ে বেশী খাবে তরকারি আর ঝোল।

বনায়ন

মোস্তফা ফেরদৌস হাজরা
হিসাব রক্ষক,এফ এস টি আই
রাজশাহী

মায়ের দয়া গাছের ছায়া তুলনা যার নাই,
এসো আমরা সবাই মিলে সেই গাছ লাগাই।
রাস্তার ধারে খালের পাড়ে আরো বসতবাড়ী,
গাছ লাগালে পাবো বিশাল অক্সিজেন ফ্যাক্টরী।
দমে দমে নির্মল বায়ু সুস্বাস্থ্য জীবন ,
বাংলাদেশ গাছে গাছে করো বনায়ন।
সোনার বাংলায় সোনা ফলে মাটি উর্বর,
গাছের টাকায় বাড়বে আয় হবে স্বনির্ভর।
গাছ দেয় ছায়া কাঠ আরো ফুল ফল,
কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে বায়ু সুনির্মল।
ফলজ গাছের ফল থেকে পাব সদা পুষ্টি,
ফলজ গাছ রোপনে থাকবে সবার দৃষ্টি।
ঔষধি গাছ মহা দাওয়া ভালো করে রোগ ব্যাধি,
নিজে হবে নিজের ডাক্তার একটু জানা থাকে যদি।
সারা দেশে রাস্তার পাশে সবুজ গাছের খনি,
সন্ধাকালে গাছের ডালে পাখির কলধ্বনি।
বন বিভাগের বনায়নে সিসিএফ ধরে হাল,
বাংলা মায়ের আচল জুড়ে ফুলে ফলে ভরা ডাল।
মরুভূমির লোকে জানে গাছের মূল্য কত,
সহজে গাছ বানাতে পারেনা চেষ্টা করে শত।
বৈরী জয়বায়ু ও সুনামি হতে সমাধান,
প্রকৃতি রক্ষায় রিও ডি জেনিরোর সম্মেলন।
সিএফসি ওজন স্তরের করে ক্ষয়,
কার্বন নির্গমন কমালে নাই কোন ভয়।

রুগ্ন ধরিত্রী

মোজাম্মেল

আমাকে এক মুঠো শীতল পরশ দাও
প্রানভরে একটু শ্বাস নেই
বেঁচে থাকার আশায়
বিবেচনাহীন স্তুপীকৃত আবর্জনায়
উৎকট গন্ধরা বাতাশে
ফুসফুস সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়
অবসন্ন সবুজ পাতারা
ঝরে পড়ে হলুদাভ হয়ে
প্রখর খরা আর অনুর্বরতায়
জীবন কেঁটে জীবনের আশায়
গড়ে তোলা অট্টালিকারা
প্রকৃতির রুদ্ররোশে কম্পমান
জলবায়ুর বিচিত্র লীলায়
সভ্য মনুষ্যের অবিবেচক কর্মে
আজ নির্বাসিত ষড়ঋতু
রোগে, শোকে ন্যুজ
ধ্বংশস্তুপে দাঁড়িয়ে সভ্যতা
পরিবেশের দারিদ্রতায় আজ রুগ্ন ধরিত্রী।

বৃক্ষরোপণ

এম এ সাত্তার
ডেসপাস রাইডার
পাল্লউড প্ল্যান্টেশন বিভাগ, বান্দরবান

এসো এসো এসো ভাই
আমরা সবাই গাছ লাগাই।
বসত বাড়ীর আশে পাশে
ভরেদে ভাই গাছে গাছে।
বসতবাড়ী রাস্তার ধারে
গাছ লাগাবো পুকুর পাড়ে।
বাঁধের ধারে প্রান্তিক ভূমি
আশে পাশের পতিত জমি।
গাছ গাছালি লাগাবো মোরা
দেশ হবে সুজলা সুফলা।
গাছ থেকে পাই জৈব সার
তাতে সৃষ্টি হবে সবুজের সমাহার।
গাছ কমাবে সাইক্লোন
তাতে রক্ষা পাবে জনজীবন।
দেশের সকল নার্সারীতে
বিপুল চারা পাবে ভাই।
হাদীস কোরআন দৃষ্টে পাই
বৃক্ষরোপণ সাদকায়ে জারীয়া ভাই।
কৃষক শ্রমিক, দিনমজুর ভাই
সকলে মিলে গাছ লাগাই।

বৃক্ষই সম্পদ

এম এ সাত্তার
ডেসপাস রাইডার
পাল্লউড প্ল্যান্টেশন বিভাগ, বান্দরবান

গাছ আমাদের পরম বন্ধু
গাছ আমাদের অমূল্য সম্পদ।

গাছ থেকে পাই অক্সিজেন
তাতে রক্ষা পায় জনজীবন।

ফল-ফলাদী খেয়ে ভাই
প্রত্যেহ শরীরের পুষ্টি যোগাই।

গাছের বিনিময়ে টাকা পাই
তাই দিয়ে জীবন বাঁচাই।

বিপদ আপদে পড়লে ভাই
গাছ বেচে সংসার চালাই।

বৃক্ষ গরীবের দূর্দিনের বন্ধু
বৃক্ষ আছে বলেই পাই আনন্দ।

বৃক্ষ ঘটায় বৃষ্টিপাত
তাতে রক্ষা পায় কৃষকের ক্ষেত।

এসো ভাই, বেশী করে গাছ লাগাই
নিজে বাঁচি, পরিবেশ বাঁচাই।

বাংলাদেশে শকুন সংরক্ষণে কার্যক্রম ও পদক্ষেপ

এ বি এম সারোয়ার আলম, মূখ্য গবেষক, শকুন সংরক্ষণ প্রকল্প, আইইউসিএন বাংলাদেশ
মোঃ জাহিদুল কবির, বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা
কাজী জেনিফার আজমিরী, প্রকল্প সহকারী, শকুন সংরক্ষণ প্রকল্প, আইইউসিএন বাংলাদেশ

আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে শকুন অতি পরিচিত একটি পাখি। একসময় শকুন দেশজুড়ে বিস্তৃত ছিল। আমাদের দেশে প্রধানত তিন প্রজাতির শকুন স্থায়ীভাবে বসবাস করত। এদের মধ্যে রাজশকুন (Red-headed Vulture) বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বাংলা শকুন (White-rumped Vulture) ও সরুঠুটি শকুন (Slender-billed Vulture) একমাত্র আবাসিক শকুন হিসেবে টিকে আছে। বাংলা শকুন বা White-rumped Vulture আমাদের দেশের একটি প্রতিকী পাখিও বটে, কারণ এর বৈজ্ঞানিক নামে *Gyps bengalensis* হলো বাংলার নাম আছে । কিন্তু বর্তমানে বাংলা শকুন অত্যন্ত দূর্লভ একটি পাখিতে পরিণত হয়েছে, এদের সংখ্যা ২৬০ এর নিচে নেমে গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই পাখির সংখ্যা ৯৯.৯% কমে গেছে। আইইউসিএন (IUCN) এর লাল তালিকায় পাখিটি মহাবিপন্ন (Critically Endangered) পাখির তালিকায় স্থান পেয়েছে।

শকুনের বিলুপ্তির পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, পশু চিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন জাতীয় ব্যাথানাশক ঔষধের ব্যবহার। পশু চিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ব্যাথানাষক ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে এমন গবাদি পশুর মৃতদেহ খাওয়ার ফলে শকুন সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। কারণ ডাইক্লোফেনাক হজমের জন্য শকুনের শরীরে কোন এনজাইম নেই। যে কারণে খাদ্যের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শকুন মারা যায়। এছাড়া, খাদ্য সংকট ও আবাসস্থল ধ্বংস শকুন বিলুপ্তির কারণ বলে বিবেচিত।

গত দুই দশকে দক্ষিন এশিয়ায় শকুন বিলুপ্তির কারণে পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। শকুনের অবর্তমানে গবাদিপশুর মৃতদেহ হতে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি (যেমন- অ্যানথ্রাক্স, খুরা রোগ, বুটুলিনাম, হগ কলেরা ইত্যাদি) দ্বারা মানুষ ও গবাদিপশু আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় শকুনের অবর্তমানে কুকুর মৃতদেহ খাচ্ছে। এর ফলে, কুকুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে জলাতঙ্ক (Rabies) সংক্রমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে। শকুনের জন্য নিরাপদ ঔষধ মেলোক্সিক্যাম পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হলে পশু ও শকুন উভয়ের জন্যই ভাল। মেলোক্সিক্যামও ব্যাথানাশক ঔষধ। ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন এর পরিবর্তে মেলোক্সিক্যামের ব্যবহার নিশ্চিত হলে শকুন সংরক্ষণে বড় অবদান রাখা যাবে। বাংলা শকুনকে প্রকৃতিতে টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন ভারত, নেপাল, পাকিস্থানে বেশ কিছু ভাল অনেক পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়ছে। আইইউসিএন বাংলাদেশ ও বন অধিদপ্তর 'শকুন সংরক্ষণ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প ২০১৪ সাল থেকে

পরিচালনা করে আসছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে-

১. সরকার কর্তৃক শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ ধারা ২০(১) অনুযায়ী দেশের দু'টি অঞ্চলকে শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করেছে। এলাকা দু'টি হচ্ছে- শকুনের নিরাপদ এলাকা-১ (সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু অংশ) শকুনের নিরাপদ এলাকা-২ (খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু অংশ)। শকুনের নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- শকুনের নিরাপদ এলাকায় ডাইক্লোফেনাক ও অন্যান্য ক্ষতিকর ঔষধের ব্যবহার শূণ্যের কোঠায় আনা, শকুনের প্রজননস্থল, বিশ্রামস্থল ও বিচরণ এলাকায় পর্যাপ্ত গাছপালা সংরক্ষণ করা, মানুষের মধ্যে শকুনের উপর প্রচলিত ভূল ধারনা ও মানুষ-শকুন দ্বন্ধ বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শকুনকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাচাঁনো। গোটা পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশের শকুনের দুইটি নিরাপদ এলাকা সরকার ঘোষিত প্রথম নিরাপদ এলাকা। এরকম মডেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করছে।

পৃথিবীর শকুন সংরক্ষণের জন্য দু'ধরণের মডেল অনুসরণ করা হয়। এর একটি হলো শকুনের নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংরক্ষণ যাকে বলে ইনসিটু কনজারভেশ অন্যটি হলে কৃত্রিমভাবে প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে শকুনের প্রজনন বাড়ানো যাকে বলে এক্সসিটু কনজারভেশন। শকুনের নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠার মাধমে সংরক্ষণ খুব সহজেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা যায় এবং এত খরচও কম। অন্যদিকে কৃত্রিম প্রজনন বেশ ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। ফলে শকুনের নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করা গেলে শকুনের সংখ্যা এমনিতেই বাড়ানো। অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করলেও বুনো পরিবেশে শকুন ছাড়তে হলে নিরাপদ এলাকার প্রয়োজন পড়ে। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শকুনের নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠার উপর বেশি জোড় দেওয়া হয়েছে।

২.শকুন সংরক্ষন দলঃ শকুনের আবাসস্থলের দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ ও শকুনের নিরাপদ এলাকার ব্যবস্থাপনার জন্য শকুনের বাসস্থানের আশেপাশের এলাকার প্রতিষ্ঠান (যেমন বনবিভাগ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন ইত্যাদি), জনসাধারণ ও পেশাজীবীদের (বিশেষত পশু চিকিৎসক, পশুপালক, ফার্মেসী মালিক ইত্যাদি) নিয়ে শকুন সংরক্ষন দল গঠন করা হয়েছে। শকুন সংরক্ষন দলের কাজ হল - শকুনের আবাসস্থল পর্যবেক্ষণ করা, প্রজননকালীন সময়ে শকুনের বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও প্রজননস্থল উপদ্রবহীন রাখা, অসুস্থ, আঘাতপ্রাপ্ত অথবা মৃত শকুন উদ্ধার করা। এখন পর্যন্ত শকুন সংরক্ষণের জন্য ছয়টি শকুন সংরক্ষন দল গঠন করা হয়েছে।

৩. শকুনের জন্য নিরাপদ খাবার সরবরাহঃ শকুনের বিচরণ এলাকায় খাবার সল্পতা ও প্রজননকালীন সময়ে বাড়তি খাবারের চাহিদা থাকায় শকুনের জন্য নিরাপদ খাবার সরবরাহ করা হয় শকুন সংরক্ষন দলের মাধ্যমে শকুনের নিরাপদ এলাকায় কোনো গবাদিপশু মারা গেলে তা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করে তা শকুনের জন্য নির্ধারিত খাবার স্থানে (Feeding station) সরবরাহ করা হয়। শকুনের ফিডিং ষ্টেশনের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে। গত ছয় বছরে ধরে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রজনন মৌসুমে বুনো শকুনেরা নিরাপদ খাবার পাচ্ছে এবং এর ফলে তাদের প্রজনন সফলতা পেয়েছে।

৪. শকুনের জন্য ক্ষতিকর ঔষধ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপঃ শকুনের নিরাপদ এলাকায় পশু চিকিৎসায় ২০১০ সালে ডাইক্লোফেনাক ও ২০১৭ সালে কিটোপ্রোফেন জাতীয় ঔষধের ব্যবহার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে ডাইক্লফেনাকের অবস্থা কি জানার জন্য নিয়মিত শুমারি করা হয়। এরই মধ্যে ৩ বার আন্ডার কভার ফার্মেসি সার্ভে করা হয়েছে। ২০১৮ সালে সর্বশেষ সার্ভেতে দেখা যায় বাংলাদেশে আর কোন ডাইক্লোফেনাক নাই। অন্যদিকে কিটোপ্রোফেনের পরিমাণও দিন দিন কছে। সরকার কিটোপ্রোফেন শকুনের দু'টি নিরাপদ এলাকায় নিষিদ্ধ করেছে। এর আয়োতন প্রায় ৪৭ হাজার বর্গকিমি। এবছর সারাদেশ কিটোপ্রোফেন নিষিদ্ধের ব্যাপারেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

৫. মেলোক্সিক্যাম বিতরন কার্যক্রমঃ বাংলা শকুন সংরক্ষণে গুরূত্বপূর্ন একটি কাজ হলো শকুনের নিরাপদ এলাকায় শকুনের জন্য নিরাপদ ঔষধ মেলোক্সিক্যামের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। সরকার এরই মধ্যে সারাদেশ থেকে পশু চিকিৎসায় ক্ষতিকর ঔষধ ডাইক্লোফেনাক ও শকুনের নিরাপদ এলাকায় কিটোপ্রোফেন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। বিকল্প ঔষধ মেলোক্সিক্যাম ব্যবহার নিরাপদ। এতে গরু বাঁচে শকুনও ভাল থাকে। শকুন সংরক্ষণে দুটি ঔষধ কোম্পানী একমি ও রেনেটা ভাল উদ্যোগ নিয়েছে। রেনেটা মেলোক্যাম নামের একটি ব্যাথানাশক ঔষধ বাজারে এনেছে। শকুন সংরক্ষণ প্রকল্প থেকে এই নিরাপদ ঔষধগুলো স্থানীয় ডাক্তার ও সংশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ফ্রি বিতরণ করা হয়েছে। মেলোক্সিক্যাম ঔষধ তৈরীর ফর্মূলা বিভিন্ন ঔষধ কম্পানিকে ফ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে গত ছয় বছরে এই নিরাপদ ঔষধটির ব্যবহার বাংলাদেশে দশভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমঃ মহাবিপন্ন শকুন সংরক্ষনে শকুনের নিরাপদ এলাকাসহ সারাদেশে জনসাধারনকে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতন করা হয়। প্রতিবছরই বিশ্ব শকুন সচেতনতা দিবস পালন করা হয়। র‍্যালী, আলোচনা সভা, বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসাধারনকে সচেতন করা হয়। তাছাড়া পথসভা, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, সভা, কর্মশালা পত্রিকা, টিভিতে নানা অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

৭. শকুন উদ্ধার ও পরিচর্যা কেন্দ্রঃ শীতকালে বিশেষত বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ এলাকায় হিমালয়ী শকুন (Himalayan Vulture) ভ্রমণ করে। অধিকাংশ পরিযায়ী শকুনেরা খাদ্যের অভাবে অসুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন এলাকায় আটকা পড়ে। বিগত বছরগুলোতে শকুন প্রকল্প হতে এইসব পরিযায়ী উদ্ধার ও পরিচর্যা ব্যবস্থা করা হয়। সারাদেশ থেকে অসুস্থ, আঘাতপ্রাপ্ত শকুন উদ্ধার করে পরির্চযা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে দিনাজপুরের শিংড়ায় শকুন উদ্ধার ও পরির্চযা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ বনবিভাগ ও স্থানীয় শকুন সংরক্ষন দলের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত শকুনকে এখানে এনে পরির্চযা করা হয়। এরপর এদের পায়ে রিং পরিয়ে ও উইং ট্যাগ করে মাপজোক নেয়া হয়। তারপর তাদের পুনরায় প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়।

৮. শকুন সংরক্ষণে আঞ্চলিক কমিটির কার্যক্রমঃ শকুনকে প্রকৃতিতে টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান মিলে ২০১২ সালে শকুন সংরক্ষণে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির নাম হলো রিজিওন্যাল স্টিয়ারিং কমিটি ফর সাউথ এশিয়ান ভালচার কনজারভেশ। প্রতিবছর এ কমিটির মিটিং হয়। এর মাধ্যমে সদস্য দেশের শকুন সংরক্ষনের আপডেট জানানো হয় এবং পরবর্তীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত ২০১৭ ও ২০১৯ সালে পর পর দুইবার বাংলাদেশে আরএসসি এর মিটিং আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার। কম্বোডিয়া এই কমিটির নতুন সদস্য দেশ হিসেবে এবার যোগদান করে। ২০২০ সালে পরবর্তী সভা পাকিস্থানে হবে। আইইউসিএন এশিয়া এই কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করছে।

৯. শকুন সংরক্ষণে জাতীয় কমিটিঃ শকুন সংরক্ষণের জন্য সরকার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। বাংলাদেশের শকুন সংরক্ষণে এই কমিটির বেশ কিছু

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর এই কমিটি ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০. বাংলাদেশ ভালচার কনজারভেশন এ্যাকশন প্লানঃ বাংলাদেশ সরকার শকুন সংরক্ষণের জন্য দশ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০২৫) 'বাংলাদেশ ভালচার কনজারভেশন এ্যাকশন প্লান' নামে একটি এ্যাকশন প্লান তৈরী করেছে এবং তার অনুমোদন দিয়েছে। এরই মধ্যে এই এ্যাকশন প্লানের বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১১. চলমান কাজঃ অন্যান্য সব কাজের পাশাপাশি শকুনের চলমান কাজের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো মৃত গবাদিপশুর কলিজার নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা। এই প্রকল্পের আওতায় শকুনের নিরাপদ এলাকা সহ সারা দেশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতিকর ঔষধ নিশ্চিত হওয়া যাবে। তাছাড়া Open ও Undercover ফার্মেসী জরিপ পরিচালনা করা হচ্ছে। শকুন উদ্ধার ও পরিচর্যা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উপসংহার

বাংলা শকুন সংরক্ষণে বেশ কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো গত ৬ বছরে গবাদি শকুনের সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে। শকুনের নিরাপদ এলাকার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ৫ বছরে শকুনের প্রজনন সাফল্য বেড়েছে ১১% (৪৪% থেকে ৫৭%)। ২০১৮ এর Undercover ফার্মেসী জরিপে কোন ডাইক্লোফেন্যাক পাওয়া যায়নি আর কিটোপ্রোফেণের ব্যবহার ১০% কমে গেছে। নিরাপদ ওষুধ মেলোক্সিক্যাম এর ব্যবহার ৯.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাংলাদেশ সরকার ১০ বছরের শকুন সংরক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। শকুনের জন্য দুটি ফিডিং ষ্টেশন ও একটি রেসকিউ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৫০টির অধিক অসুস্থ পরিযায়ী হিমালয়ান গৃধিনি সুস্থ করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের মহাবিপন্ন কাছিম 'বড় কাইট্টা' সংরক্ষণ

শামীম আহমেদ
কো-অর্ডিনেটর, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন

শান্ত স্বভাবের প্রাণী কাছিম। এরা কাইট্টা বা কচ্ছপ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশ প্রায় ২৫ প্রজাতির স্থলজ ও মিঠাপানির এবং ৫ প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিমে আবাস। বাংলাদেশের কাছিমের প্রায় সব প্রজাতিই বিপন্নের তালিকায় রয়েছে। স্থলজ বা জলজ কোন কাছিম প্রজাতিই বর্তমানে বিপদমুক্ত নয়। আইইউসিএন রেড বুকের তথ্যানুযায়ী এদেশের প্রায় ১৪ প্রজাতি মহাবিপন্ন অবস্থায় আছে। অতীতে এদেরকে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পুকুর, নদী ও খালে পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে।

একসময় এদেশের প্রায় সব জলাভূমিতেই কাছিম পাওয়া যেত। পানিতে ভেসে বেড়ানো বা পানির ধারে রোদ পোহানো কাছিম বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি সাধারণ দৃশ্য ছিল। কিন্তু এখন আর এরকম কিছু আমাদের চোখে পড়ে না। কারণ আগের মত নদ-নদীতে এদের প্রাচুর্য নেই। এক দশক আগেও দেশের নদী-নালা, খাল-বিলে ১৫-১৬ প্রজাতির কাছিম দেখা যেত। কিন্তু জলাশয় ও নদীগুলোর নাব্যহীনতা, দূষণ, ভরাট, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং নির্বিচারে নিধনের ফলে মিঠাপানি ও পাহাড়ি কাছিমগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এছাড়া আমাদের দেশে কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে কাছিমের মাংস এবং ডিম জনপ্রিয় একটি খাবার। কাছিমের মাংস ও ডিম নিয়ে কিছু কুসংস্কারও প্রচলিত আছে। যার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে কাছিম সংগ্রহ করছে ফলে এর চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। এই চাহিদার পুরোটাই আসে প্রকৃতি থেকে। ফলে প্রতিবছর লাখ লাখ কাছিমকে জীবন দিতে হচ্ছে। কাছিম নিয়ে অবৈধ বানিজ্য প্রকৃতিতে কাছিমের বিপন্নতার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে প্রায় ১৭ প্রজাতির কাছিম খাওয়া এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত শিকার করা হয়।

বাংলাদেশের বড় কাইট্টা *(Batagur baska)* বিশ্বব্যাপি মহাবিপন্ন একটি কাছিম। এক সময় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন জলাশয়ে এদের দেখা গেলেও এখন শুধুমাত্র সুন্দরবন এলাকাতেই এরা অল্প সংখ্যায় টিকে আছে। অন্যান্য বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি সুন্দরবনের নদীগুলোতে আশ্রয় মিলেছে বড় কাইট্টার। এরা বড় আকারের জলচর কাছিম। বড় কাইট্টা মিঠাপানির বড় কাছিমগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদের পিঠের দিকের খোলস কালচে বা বাদামি রঙের আর বুকের দিকে খোলস হলদে সাদা। তবে বাচ্চা কাইট্টাগুলো জলপাইরঙা হয়ে থাকে। বাচ্চা কাইট্টার পিঠের খোলসে স্পষ্ট ভাঁজ থাকে এবং খোলসের কিনার অনেকটা করাতের মত ধারালো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই খাঁজগুলো মিলিয়ে যায় তাই পূর্ণবয়স্ক কাইট্টার পিঠের খোলস বেশ মসৃণ। এদের মাথা তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও গলা বেশ লম্বা। সামনের পায়ে চারটি করে নখর আছে। এছাড়া সামনের পায়ে কয়েক সারিতে ছোট ছোট আইঁশ দেখা যায়। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী কাইট্টার শরীরে বাহ্যিক

কোন পরিবর্তন না ঘটলেও পুরুষ কাইট্টার মাথা ও গলার নিচের অংশ কালচে রঙ এবং বুকের অগ্রভাগ ও সামনের পায়ের অংশ লাল রঙ ধারণ করে। এসময় পুরুষ কাইট্টার চোখের রঙ কিছুটা হলদে হয়ে যায়। বড় কাইট্টা দিবাচর সরীসৃপ। এরা দিনের বেলাতেই বেশি সক্রিয় থাকে। এরা মিঠাপানি ও লবনাক্ত পানি, দুই ধরনের পরিবেশেই থাকতে পারে। বড় কাইট্টা মূলত জলচর প্রাণী হলেও প্রজনন মৌসুমে উপকূলবর্তী নদী তীর ও মোহনার বালুচরে ডিম দেয়। স্ত্রী কাইট্টা প্রতিবারে প্রায় ৩০ টি ডিম দেয়। মাঝারি আকারের ডিম দেখতে সাদা ও লম্বাটে। বড় কাইট্টা মূলত বিভিন্ন উদ্ভিদের ফল, পাতা খেয়ে জীবনধারন করে। সুন্দরি গাছের ফল এদের বেশ প্রিয় খাবার। তবে অন্যান্য কাছিমের মত এদের বর্তমান অবস্থা ভাল নয়।

বাংলাদেশের এই বিপন্ন কাছিম সংরক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু কার্যক্রম চলছে। অনেক সমস্যার মধ্যেও এই ধরনের কর্মকান্ড কাছিম সংরক্ষণে কিছুটা আশার আলো। এসকল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, ডিম সংরক্ষণ করে বাচ্চা ফোটানো, অবৈধ শিকার ও বানিজ্য বন্ধে জনসচেতসনতা তৈরি ও অবৈধ পাচার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা। এছাড়া নিরাপদ বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃত্তিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করে বিপন্ন কাছিম সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মহাবিপন্ন কাছিম বড় কাইট্টা সংরক্ষণে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানার সম্মিলিত এই কার্যক্রমের মাধ্যমে নানা ধরনের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় সুন্দরবনের করমজল এবং ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছিম প্রজনন কেন্দ্র বড় কাইট্টা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কাছিমের প্রজনন সফল করতে প্রাপ্তবয়স্ক কাছিমগুলোর জন্য তৈরিকৃত জলাশয়ের পাশে বালুময় পাড় তৈরি করা হয়েছে, যাতে এরা প্রজনন মৌসুমে বাসা তৈরি ও ডিম দিতে পারে। পাশাপাশি বাচ্চা কাছিমগুলোর জন্য আলাদা হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে। বন বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত স্থানে ৪-৫ বছর বয়স্ক বাচ্চা কাছিমগুলোর জন্য নতুন পুকুর খনন করা হয়েছে। কাছিমের রোদ পোহানোর কাঠামোও তৈরি করা হয়েছে জলাশয়ের মাঝে। প্রজনন মৌসুমে মা কাছিম বালুর মধ্যে যে ডিম দেয় সেগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করে বাচ্চা ফোটানো হয়। বড় কাইট্টার ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো এবং এই বচ্চাগুলোকে বড় করে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়াই এই কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য।

কাছিমের নিরাপদ প্রাকৃতিক আবাসভূমি নিশ্চিত করতেও চলছে নানা ধরনের কার্যক্রম। আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্রাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে ভিয়েনা জু এর কারিগরি সহায়তায় প্রথম দুটি কাছিমে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার সংযুক্ত করে সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়, তবে কাছিমগুলো জেলেদের জালে আটকে পড়ার কারনে পর্যপ্ত তথ্য পাওয়া যায় নি। তাই ২০১৮ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে ৫টি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কাছিমের পিঠে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সুন্দরবনের দক্ষিণে ট্রান্সমিটারযুক্ত কাছিমগুলো অবমুক্ত করা হয়। কাছিমগুলোর অবমুক্ত করার প্রধান উদ্দেশ্য কাছিমের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও প্রজনন মৌসুমে কাছিমগুলোর আচরণ পর্যবেক্ষণ করা।

ভাওয়াল ও করমজল প্রজনন কেন্দ্রে বড় কাইট্টার বর্তমান পরিসংখ্যান ঃ

প্রজনন কেন্দ্র	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী	বাচ্চা	উদ্ধারকৃত বাচ্চা কাছিম	মোট সংখ্যা
ভাওয়াল	১০	৪	১০৫	১	১২০
করমজল	৬ + (৫*)	৪	১৩৩	২	১৪৫

*স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং ডিভাইসযুক্ত ৫টি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কাছিম প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপি মহাবিপন্ন কাছিম সংরক্ষণে বাংলাদেশের বড় কাইট্টা সংরক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম সফল প্রকল্প, তবে এই সকল কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। কাছিম ও এদের আবাসস্থল নিয়ে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন। পাশাপাশি এদের আবাসস্থল সংরক্ষণে কর্যকরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। সর্বোপরি স্থলজ ও জলীয় প্রতিবেশব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী কাছিমদের রক্ষায় সবার সচেতনতা, সহযোগিতা ও বন্যপ্রাণী আইনের সঠিক বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

বনাঞ্চল ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ভূমিকা

অসিত রঞ্জন পাল

Conservator of Forests(Rtd.). Consultant, (Forestry & Ecosystem)
Palli Sanchay Bank.

জীববৈচিত্র ও ইকোসিস্টেম বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীতে একটি অতি সমৃদ্ধ দেশ। বিপুল সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণ বৈচিত্রের সমৃদ্ধতাকে আরও তরান্বিত করেছে এদেশের জলাভূমি। ছোট বড় ৭০০টি নদী, চলন বিল, টাঙ্গুয়ার হাওড়, বাইক্কা বিল, কাপ্তাই লেক অন্যতম। এ সকল নদী ও জলাশয়ে রয়েছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও জলজ প্রানী। ২৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশের বনভূমি। সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলা জুড়ে রয়েছে বিস্তৃর্ণ পাহাড়ী বন। এ সকল বনাঞ্চল জীব বৈচিত্রের আধাঁর হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ Natural Mangrove Forest; সুন্দরবনের অবস্থান বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলাতে। অপরদিকে ৭১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলে তৈরী করা হয়েছে ২ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় বন। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে এবং মধ্য অংশে রয়েছে শালবনের সমাহার। বাংলাদেশের স্থল ভাগের বণাঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির বনজ, ফলজ ও ঔষধি জাতের গাছ গাছড়া। নদী, খাল বিল ও জলাশয়ে রয়েছে ৫৫০ প্রজাতির মাছ ১৬ প্রজাতির কাকড়া, ৫৬ প্রজাতির চিংড়ি। তাছাড়া বাংলাদেশের সমূদ্র সীমানাধীন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নোগ্রাউন্ড এ রয়েছে মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া, যার আয়তন ১৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে রয়েছে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির তিমি, হাঙ্গর, শুশুক, জলজ উদ্ভিদ ও প্রানী প্রভৃতি সমৃদ্ধ করেছে এদেশের সমুদ্র সম্পদকে। আমাদের দেশ জুড়ে রয়েছে প্রায় ৭০০ প্রজাতির পাখি। অপরদিকে সুন্দরবনে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং অসংখ্য চিত্রা হরিণ।

অপরদিকে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। জমির উর্বরতার কারণে বিভিন্ন প্রজাতির কৃষিজ ফসলের উৎপাদন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তাছাড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে বিভিন্ন জাতের ফলের গাছ। বসতবাড়ী ছাড়াও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অনেকেই আম, লিচু, কূলসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলের বাগান করছে। একইভাবে মৎস চাষ গবাদি পশু লালন-পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, হাস-মুরগীর খামার প্রভৃতি কৃষি নির্ভর কর্মকান্ডে বহু মানুষ সম্পৃক্ত রয়েছে, ফলশ্রুতিতে শিল্প সেক্টরের পাশাপাশি কৃষি সেক্টরেও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহের মধ্যে অন্যতম। দেশের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য নিবেদিত এ উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে ইনসেনটিভ প্রদান একটি ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ। তাছাড়া সমিতির সদস্যদের মধ্যে আয়বর্ধক কার্যক্রম তথা খামার সৃষ্টির জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিল সৃষ্টি, মাত্র ৮% সরল সুদে মৌসুমী ঋণ প্রদান, কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন, বিপণন ইত্যাদি কর্মসুচী সমন্বিত আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প ইতোমধ্যে পল্লী অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অদ্যাবধি সারাদেশে প্রায় ৯১,০০০টি সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং এ সকল সমিতিতে প্রায় ৪০ লক্ষ দরিদ্র পরিবার সম্পৃক্ত রয়েছে। এর মধ্য হতে ইতোমধ্যে ৪০২১৫ টি সমিতি পল্লীসঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২২ লক্ষ দরিদ্র পরিবার। এ সকল দরিদ্র পরিবারগুলো নিজেরাই প্রায় ১৫৬৬ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছেন। তাছাড়া গঠিত সমিতিসমূহের মিউচুয়াল তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৫,৩৬৮ কোটি টাকা যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ৫৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে আশা করা যায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমিতির সদস্যগণ যে এলাকায় বসবাস করেন সেখানে অথবা তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বা এলাকা দিয়ে বয়ে গেছে কোন নদী বা খাল অথবা রয়েছে কোন হাওড়, বাওড়, বিল, পুকুর বা জলাশয়। তাছাড়া কোন অঞ্চলে রয়েছে পাহাড়ী ভূমি, বনাঞ্চল, ফসলি জমি, গাছপালা সম্বৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ। কোথাও রয়েছে পাখি বা অন্য কোন বন্যপ্রানীর আবাসস্থল বা বিচরণ ক্ষেত্র। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষন ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের নিমিত্তে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের তরফ হতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পল্লী অঞ্চলের এসকল মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য ইকোসিস্টেম ভিত্তিক সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতো মধ্যে যে সব বিষয়ে সমিতি গঠিত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে এসব সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। মধুপুর বন সংরক্ষণ সমিতি।
২। হালদা নদী সংরক্ষণ সমিতি।
৩। ইলিশের আবাসস্থল সংরক্ষণ সমিতি।
৪। রাতারগুল জলজ বন সংরক্ষণ সমিতি।
৫। টাঙ্গুয়ার হাওড় সংরক্ষণ সমিতি।
৬। উত্তরবঙ্গে পাখি সংরক্ষণ সমিতি।
৭। ডলফিন সংরক্ষণ সমিতি।
৮। উপকূলীয় বনাঞ্চল অঞ্চল সংরক্ষণ সমিতি।
৯। পাহাড়ী বনাঞ্চল সংরক্ষণ সমিতি, প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধশালী মধুপুর বনাঞ্চল কালের বির্বতনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, বনের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনসাধারনকে সম্পৃক্ত করে বন বিভাগ, পুনরায় মধুপুর বনকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। এরজন্য বনবিভাগ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। বনের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বনবিভাগকে সহযোগীতা করছে।

একইভাবে বনবিভাগ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন protected area যেমন, জাতীয় উদ্যান, গেইম বিজার্ড, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যসহ বিভিন্ন পাহাড়ী, জলজ, উপকূলীয় বন সংরক্ষনের নিমিত্তে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে তাদেরকে সমিতিভূক্ত করে বনাঞ্চল ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

আমরা জানি হালদা নদী পৃথিবীর একমাত্র নদী যেখানে একটি বিশেষ পরিবেশে বিশেষ মূহুর্তে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস ও কার্প জাতীয় মাতৃমাছ ডিম ছাড়ে এবং স্থানীয় জেলে ও মৎস্যজীবিগণ নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে থাকে। নদীদূষন, প্রবাহ এবং পানির স্তর হ্রাসসহ বিভিন্ন কারণে হালদা নদীতে মাতৃমাছের নিষিক্ত ডিমের প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে হালদা নদীর দু ধারে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে হালদানদী সংরক্ষন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও নদীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস কল্পে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের অধীনে সমিতি গঠনের কার্যক্রম চলছে।

উল্লেখ্য আজ থেকে দশ বছর আগে ইলিশের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল প্রায় দুই লক্ষ মেট্রিকটন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইলিশের অভয়ারণ্য ঘোষণা, মা-ইলিশ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞার সময় বৃদ্ধি (১১ দিনের ক্ষেত্রে ২২ দিন), ইলিশের উপর নির্ভরশীল জেলেগোষ্ঠিকে খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন সহযোগীতার কারণে বর্তমানে

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টন হয়েছে। এ অবস্থাকে টেকসই করতে হলে ইলিশের শিকার, সংগ্রহ, পরিবহন ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের ২৮ টি জেলাধীন ১৫০ টি উপজেলার ৭ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ণের জন্য তাদের আয়বর্ধক বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দাদন-মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার জন্য সমিতি গঠনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে; আগামী বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মবার্ষিক পালিত হবে। বাংলাদেশের বন ও প্রকৃতি সংরক্ষনের নিমিত্তে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমার বাড়ি আমার খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উদ্যেগে সাড়াদেশের ৫ টি এলাকায় প্রকৃতি ও বন মেলার আয়োজনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ২১ মার্চ ২০২০, বিশ্ব বন দিবসে উক্ত মেলার উদ্বোধন করা হবে।

তাছাড়া আমার বাড়ী আমার খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ৯৬,৫০০ সংখ্যক সমিতিতে ৪০ লক্ষ সদস্য পরিবারদের প্রতিটি বাড়ীর আঙ্গিনায় অন্তত তিনটি করে বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ৪৮৫ টি উপজেলার আওতাধীণ প্রতিটি ইউনিয়নে দেশীয় ফলসহ অনান্য দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষের চারা উৎপাদনের জন্য ১ টি করে নার্সারী স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইকোসিস্টেম ও ইকোসিস্টেমগত সেবা নবায়নযোগ্য সম্পদ (Renewable Resource) হলেও এর পুনর্ভরণ (recharge) ক্ষমতা অসীম নয়। বেশী মাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং প্রকৃতিগত ও মানবসৃষ্ট অনেক কারণে এর পুনর্ভরণ ক্ষমতা-হ্রাস পাচ্ছে তবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ণের জন্য এ সকল ইকোসিষ্টেম সংরক্ষন ও টেকসই উন্নয়ন অতন্ত অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা নির্ভরশীল তাদেরকে সংঘঠিত করে, তাদের পছন্দনীয় আয়বর্ধক বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের বনের উপর তাদের নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে, অপরদিকে ঐ সকল সম্পদ সংরক্ষনে তারা আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে।

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার পরিচিতি

মোঃ সোহেল রানা
হারপেটোলজিস্ট, শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্ঠি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অবস্থান ও আয়তন

ঢাকা প্রশাসনিক বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলাস্থ গাজীপুর সদর উপজেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ডের ১৮ নং আড়ইশ প্রসাদ মৌজায় শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি অবস্থিত। এটি গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরে ৬-৭ কি.মি.দুরে মাস্টারবাড়ী নামক স্থানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে ঢাক-ময়মনসিং মহাসড়কের পূর্বপার্শে নির্মিত। এর মোট আয়তন ৩০ একর। যার মধ্যে ৬.৮৫ একর জায়গার উপর প্রাশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ৫০০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন, প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে।

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের প্রধান ফটক

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের একাডেমিক ভবন

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বন, বন্যপ্রানী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এই সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতের সকল পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও আগ্রহী দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;

৩. দেশীয় বন্যপ্রাণী এবং বনজ সম্পদ সমূহকে সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যাহা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে উপযুক্ত উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান;

৪. ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স ডিজাইন, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন ও সার্টিফিকেট প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও অনুমোদন গ্রহণ;

৬. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে বন, বন্যপ্রাণী ও এর অবাসস্থল বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং সেন্টারকে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সেক্টরের রেফরেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

৭. বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়নের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার ও উক্ত বিষয়ক সমস্যার উপর দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিষেশজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;

৮. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ;

৯. বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সুরক্ষা, গবেষণা ও প্রতিবেশবান্ধব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সুযোগ সুবিধাসমূহ

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আন্তর্জাতিক মানের। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদের মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিম্ন লিখিত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে:

১। একাডেমিক ভবন;
২। পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত শ্রেণীকক্ষ;
৩। খেলার মাঠ;
৪। ৫০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়তন;
৫। ৩৬ কক্ষবিশিষ্ট অফিসার্স ডরমেটরী;
৬। কনফারেন্স রুম;
৭। লাইব্রেরী;
৮। অফিসার্স কোয়ার্টার;

একাডেমিক ভবন

অফিসার্স ডরমেটরী

৫০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়তন

অফিসার্স কোয়ার্টার

কনফারেন্স রুম

শ্রেণীকক্ষে চলমান প্রশিক্ষণ

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে কার্যক্রম

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার ২০১৩ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। ইতোমধ্যে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত জরিপ, গবেষণা, বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন রক্ষিত বনাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণসহ নিম্নলিখিত কাজ করেছে;

গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- ❒ Accomplished a research project of "Implementation of Wildlife and Ecosystem Conservation Priorities of the National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) in Teknaf Wildlife Sanctuary & Inani Reserve Forest";
- ❒ Prepared of a popular book on wildlife and plant of Teknaf Wildlife Sanctuary and Inani Reserve Forest;
- ❒ Prepared of Social Management Plan (SMP) of Teknaf Wildlife Sanctuary;
- ❒ Prepared of Tribal People Plan (TPP) of Teknaf Wildlife Sanctuary;
- ❒ Prepared of Business Plan for Sheikh Kamal Wildlife Center;
- ❒ Prepared of Management Plans on six (6) Protected Area (PAs)-
  - ● Teknaf Wildlife Sanctuary;
  - ● Sundarban (South) Wildlife Sanctuary;
  - ● Kuakata National Park;
  - ● Char Kukri-Mukri Wildlife Sanctuary;
  - ● Ramsagar National Park and
  - ● Kadigar National Park.

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ণ প্রকল্পের আওতায় বিগত ২০১৭-১৮ ইং ও ২০১৮-১৯ ইং অর্থবছরে ইতোমধ্যে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থী (ফরেস্টার, ওয়াইল্ডলাইফ স্কাউট, কম্পাউন্ডার, ল্যাব টেকনিশিয়ান, বন্যপ্রাণী রক্ষক, জুনিয়র ওয়াইল্ডলাইফ স্কাউট, বন প্রহরী, নৌকা চালক, নৈশ প্রহরী ও বাগান মালী প্রভৃতি) এইসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

সংক্ষিপ্ত কোর্স (৩ দিন- ৩ সপ্তাহ)

ক. বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাব শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।
খ. বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক ৭ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।
গ. বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ২১ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৭ দিন, ১০ দিন, ১৪ দিন ও ২১ দিন ব্যাপি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক প্রশিক্ষণের গ্রুপ ছবি

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

মিহির কুমার দো
পরিচালক, বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট
নার্গিস সুলতানা
বন্যপ্রাণী পরিদর্শক, বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই সারাদেশে বন্যপ্রাণী ও ট্রফি উদ্ধার, উদ্ধারের পর বন্য এবং অনূকুল আবাসস্থলে বন্যপ্রাণী মুক্ত, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর ট্রফি উদ্ধার, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং- উৎস সৃষ্টি ও ডেটাবেস তৈরি, বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখা, ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ে শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানি যে, আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু এর জনসংখ্যা ১৬ কোটির উর্ধ্বে। এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বাড়ছে। এই বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে যেন প্রকৃতি তার অপার করুণা ঢেলে দিয়েছে এই দেশটির ভেতর। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত জীব-বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের পাখির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় গোটা ইউরোপের পাখি প্রজাতির সংখ্যার সমান। বাংলাদেশে রয়েছে Royal Bengal Tiger, Asian Elephant, Hoolock Gibbon এবং Asiatic Black Bear এর মত Flagship Species।

কিন্তু অত্যান্ত দু:খের বিষয় বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের এই অমূল্য সম্পদ আজ হুমকির সম্মুখীন। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্তির পিছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস ও জনসচেতনতার অভাব, বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। তাছাড়া পাচারকারীদের কালো থাবা থেকেও বন্যপ্রাণীরাও আজ নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, মানুষের মাঝে সচেতনতার অভাব, বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান দিন দিন বন্যপ্রাণীকে বিপন্ন করে তুলছে। CITES এর ২০০৮ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় ৪৪,৪৩৮ প্রজাতির মধ্যে ১৬,৯২৮টি হুমকির সম্মুখীন (Threatened), ৮৬৯টি বিলুপ্ত (Extinct), ৩২৪৬টি মহাবিপন্ন (Critically Endangered), ৮৯১২টি বিপন্ন (Endangered), ৩৭৯৬টি সংকটাপন্ন (Not Threatened), ৫,৭৭০টি তথ্য অপর্যাপ্ত (Data Defficient) ও ১৭,৬৭৫টি হুমকির সম্মুখীন নয় (Least Concern)। পৃথিবীতে বন্যপ্রাণী ও দেহাবশেষ পাচারের পরিমান মাদকদ্রব্য, অস্ত্র ও সোনা চোরাচালান একই পর্যায়ে চিহ্নিত হয়েছে। আইভরীর জন্য দাঁতাল হাতী ও গন্ডার মারা হচ্ছে; চামড়া ও হাঁড়ের জন্য বাঘ মারা হচ্ছে; মাংসের জন্য হরিণ ও পাখি মারা হচ্ছে এবং এর ফলে বন্যপ্রাণীর লাল তালিকা (Red list) দীর্ঘায়িত হচ্ছে। INTERPOL এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ১০-২০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের মূল্যের বন্যপ্রাণীর ট্রফি, আইভরী, চামড়া, হাঁড়, মাংস, জীবিত বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণী হতে সনাতনী ঔষধ ও বিলাস বহুল দ্রব্যাদি পাচার হচ্ছে। যার ফলে অধিকাংশ বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দ্রুতহ্রাস পাচ্ছে। আমাদের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে গত কয়েক দশকের ব্যবধানে আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে একশিঙা গন্ডার, বারশিঙা, প্যারা হরিণ, বুনো মহিশ, রাজ শকুন, গোলাপী শির হাঁস, মিঠা পানির কুমির ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় দেশের বন্যপ্রাণী পাচার রোধে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (Wildlife Crime Control Unit, সংক্ষেপে WCCU) গঠন করা হয়। শুরুতে এই ইউনিটের কার্যক্রম বন ভবন, মহাখালী থেকে পরিচালনা করা হতো। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে বন ভবন, আগারগাঁও এর সপ্তম তলায় ইউনিটের নতুন কার্যালয় স্থাপন করা হয়।

এই ইউনিট গঠনের পর একজন পরিচালক, একজন সহকারী বন সংরক্ষক, ছয়জন কর্মকর্তা, এবং একজন জুনিয়র ওয়াইল্ডলাইফ স্কাউট নিয়ে ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে এই ইউনিটের জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্তমান জনবল

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকাতে বর্তমানে মোট ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। উল্লেখিত জনবলের মধ্যে ১০ জন রাজস্ব খাতভূক্ত এবং ০৬ জন বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত।

পদের নাম	পরিচালক	সহকারী বন সংরক্ষক	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা	বন্যপ্রাণী পরিদর্শক	উর্ধ্বতন ল্যাব টেকনিশিয়ান	ফরেস্টার	ল্যাব টেকনিশিয়ান	জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট	ফরেস্ট গার্ড	ড্রাইভার	নৈশ প্রহরী	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	অফিস সহায়ক
বিদ্যমান জনবল	০১ জন	০১ জন	০১ জন	০৩ জন	০১ জন	০১ জন	০১ জন	০১ জন	০১ জন	০১ জন	০১ জন	০২ জন	০১ জন

বর্তমান অবস্থা

Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্তমানে" বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী বোঝাতে আমরা যা জানি তার সবগুলোই প্রায় কেনা-বেঁচা হতে দেখা যায় বিভিন্ন এলাকায়। বিশেষ করে কচ্ছপ, টিয়া, ময়না,কালিম, ঘুঘু, মুনিয়া, ডাহুক, বক, পানকৌড়ি, অতিথি পাখি, বানর, হনুমান, উল্লুক, ভাল্লুক, বাঘ, হরিণ, কুমির, সাপ, বনরুই, বনবিড়াল, গন্ধগকুল ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। যে সব স্থানে বন্যপ্রাণীগুলো বেশি ক্রয়-বিক্রয় হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান হল ঢাকাস্থ কাঁটাবন, কাপ্তান বাজার, মিরপুর-১, ১৪, শাখারী বাজার, মোহাম্মদপুর, কামরাঙ্গীরচর, শাহজাহানপুর তথা ঢাকার ব্যস্ততম কিছু মোড়ে (কাওরান বাজার, ধানমন্ডি,শাহবাগ, মিরপুর-১০, যাত্রাবাড়ী, শ্যামলী ইত্যাদি) অতিথি পাখি হরহামেশা বিক্রয় হয়। এ সকল স্থানে বিভিন্ন সময়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীসহ বেশ কিছু মামলার মাধ্যমে আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করে। ফলে এ সকল স্থানে বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে কমে গেছে। ঢাকার বাইরে বিশেষ করে টঙ্গি বাজার, সাভার বাজার, গাজীপুর চৌরাস্তা, নারায়নগঞ্জ, ভৈরব বাজার (কিশোরগঞ্জ), পুটিয়া বাজার (নরসিংদী), ফেনী, চট্রগ্রাম, বান্দরবন, সিলেট, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলাসহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে। এর ফলে কয়েকশত মামলাসহ হাজার হাজার বন্যপ্রাণী জব্দ করে প্রকৃতিতে

অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ হচ্ছে বন্যপ্রাণী ক্রয়- বিক্রয়ের আন্তর্জাতিক পথ। ফলে আমাদের বিমান বন্দর, স্থল বন্দর, নৌ বন্দরে বিভিন্ন সময়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে হাজার হাজার কোটি টাকার দেশী ও বিদেশী বন্যপ্রাণী এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রফি (বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ দিয়ে তৈরী মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি) উদ্ধার করা ও মামলা প্রদান করা হয়। ফলে অপরাধের মাত্রা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অত্র ইউনিট সমগ্র দেশে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত প্রদানসহ সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে এ পর্যন্ত (২০১২ থেকে ডিসেম্বর,২০১৮)মোট ২৭,৩৫১টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

ফরেনসিক ল্যাব

Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকল্পের অধীনে ২০১২ সালে এই ইউনিটের আওতায় জীনগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ট্রফি/অবৈধভাবে বিক্রির নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর শরীরের প্রসেসকৃত অংশ ও ডেরিভেটিভস চিহ্নিত করা এবং জীনগত সিকোয়েন্স এর ডেটাবেস তৈরির উদ্দেশ্যে একটি ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর কার্যক্রম ইউনিটের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের লক্ষ্য

- ❑ অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রোধ করা;
- ❑ বন্যপ্রাণী মারা ও ক্রয়-বিক্রয় রোধ করা;
- ❑ বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত মামলা দায়ের করা এবং পরিচালনা করা;
- ❑ অবৈধ বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় রোধে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ❑ বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কার্যকরী ডেটাবেস তৈরি করা;
- ❑ জীনগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ট্রফি/অবৈধভাবে বিক্রির নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর শরীরের প্রসেসকৃত অংশ ও ডেরিভেটিভস চিহ্নিত করা এবং জীনগত সিকোয়েন্স এর ডেটাবেস তৈরি করা;
- ❑ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম

- ❑ অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন;
- ❑ অবৈধ বন্যপ্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় রোধকল্পে সমগ্র দেশে হটস্পট (Hotspot) চিহ্নিত করা এবং সকল পয়েন্টে নিয়মিত টহল প্রদান;
- ❑ অবৈধ বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য রোধকল্পে স্থানীয় বন্যপ্রাণীর বাজার পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা করা;
- ❑ দেশব্যাপী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের তাগিদে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

- বন্যপ্রাণীর কালোবাজারি, চোরাচালানির পথ, অপরাধ প্রবণ এলাকা সনাক্ত ও বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রোধকল্পে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ;
- অবৈধ বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় রোধে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল অথবা আবাসের উপযোগী বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা;
- বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন করে বন্যপ্রাণী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা;
- আহত/অসুস্থ বন্যপ্রাণীর পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- দলছুট হওয়া অথবা বিভিন্ন কারণে লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণী কে উদ্ধার করে তাদেরকে প্রাকৃতিক আবাসস্থল অথবা আবাসের উপযোগী বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা, ইত্যাদি।

০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ ইং তারিখে গাজীপুরের নগর বাজার থেকে উদ্ধারকৃত ০৬ টি সুন্ধি কাছিম (ওজন ৩২ কেজি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন, সচিব ও প্রধান বন সংরক্ষকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করেন।

০৫ এপ্রিল, ২০১৯ ইং তারিখ নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া ও ফতুল্লা এবং কামরাঙ্গীরচর থেকে উদ্ধারকৃত ৩৩৬ টি বন্যপ্রাণী প্রধান বন সংরক্ষক মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী স্যার প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করেন।

৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ঢাকা এবং র‍্যাব সদর দপ্তর এর যৌথ অভিযানে টংঙ্গীবাজার থেকে ০১ টি বানর, ১৯টি বালিহাঁস, ৫টি পেঁচা, ১৫টি শালিখ, ৫টি ঘুঘু, ১টি কালিম, ২টি কাঠবিড়ালী এবং ৭টি টিয়া সহ মোট ৫৫টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়। আল হাদি নামে এক জন আসামিকে ৫০,০০০ টাকা অর্থদন্ড করেন র‍্যাবসদর দপ্তর এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: সারওয়ার আলম। উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীগুলো ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করা হয়।

১৬ নভেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখ ঢাকাস্থ মিরপুর ১ এর বাজার থেকে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রকারের ৪৮টি পাখি উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত পাখিগুলোকে পরবর্তীতে মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে অবমুক্ত করা হয়।

চেঙ্গিস খানের দেশে

ইমরান আহমেদ
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

Chinggis Khan International Airport এ নেমে ইমিগ্রেশনের আনুষাঙ্গিকতা সেরে বহির্গমন লাউঞ্জে দেখি অপেক্ষমান একজনের হাতে আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড। তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেই তিনি বুঝে গেলেন আমিই তার কাঙ্খিত অতিথি। তাছাড়া আজকাল ফেসবুকের যুগে আগে থেকেই আগন্তুকের ছবি বা প্রোফাইল দেখে একটা প্রাথমিক ধারণা সহজেই পাওয়া যায়। আমাকে নিতে এসেছে মঙ্গোলিয়া ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষেই সে জিজ্ঞেস করল গরম কাপড় এনেছি কিনা। এয়ারপোর্ট থেকে বের হতেই তীব্র ঠান্ডা তীরের মত আমার শরীরে এসে বিঁধতে লাগল। হাতের ব্যাগে থাকা জহির ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে আনা হাঁসের পালক দিয়ে তৈরী পুরু জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে কোন মতে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে তবে রক্ষা।

Fifth Meetings of the APFNet Board of Directors and Council, ২০১৯ এ যোগদানের জন্য Asia Pacific Forestry Network (APFNet) এর বাংলাদেশের Council Representative হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়েরই যাওয়ার কথা। কিন্তু একই দিনে তাঁর মালদ্বীপে আরেকটি প্রোগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় APFNet এর বাংলাদেশের Contact person হিসেবে আমার সুযোগ হল মঙ্গোলিয়া যাবার। মন্ত্রণালয়ের জি.ও. ইস্যু হওয়ার পর যাওয়ার আগে ভাবলাম ওখানকার আবহাওয়াটা কেমন একটু দেখি। ইন্টারনেটে দেখে তো মাথায় হাত। ওখানে দিনের বেলায় তাপমাত্রা -২ ডিগ্রী আর রাতে -১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বিষয়টা যখন দেখছি সেই মুহূর্তে আমি কিন্তু প্রচন্ড গরমে ঘামছি। এত ঠান্ডায় যাবার জন্য গরম কাপড় যেগুলো আমাদের শীতকালে পড়ি সেগুলো যথেষ্ট নয়। দেশে গরম পড়ে গেছে, বাজারে শীতের কাপড়ও নেই। হঠাৎ মনে হল, RIMS এর উপ-বন সংরক্ষক জহির ইকবাল অনেকদিন ভূটানে চাকরি করেছেন, তার কাছে নিশ্চয়ই গরম কাপড় থাকবে। পাওয়াও গেল ইয়া মোটা আর ভারী ভারী জ্যাকেট, কানটুপি আর হাতমোজা।

নদীর বুকে হেঁটে চলা

বিশ্বের শীতলতম রাজধানী শহরের কথা বললে সাধারনভাবেই আমাদের মাথায় আসে কানাডা, রাশিয়া, আইসল্যান্ড কিংবা অন্য কোন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের কথা। অথচ জেনে অবাক হলাম মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটর হল বিশ্বের শীতলতম রাজধানী। এই শহরের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা -১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই শহরে শীতকালে তাপমাত্রা -৩৬ ডিগ্রি থেকে -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামে।

উলানবাটর শহরে দেখা মিলল জমাটবাধা নদী 'তুল নদী'। ৭০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীটি আপদমস্তক জমাট বাধা বরফ। হয়তো বছরের কোন সময় এটা কিছুটা গলে। নদীর বুকে দেখলাম কিছু শিশু খেলা করছে। সাহস করে নেমে পড়লাম। হেঁটে পার হলাম নদীটি, সে এক অন্যরকম অনুভূতি। নদীর পারে আমাদের দেশের চটপটিওয়ালাদের মত বসেছে কাবাবওয়ালা। সাইকেল বা ভ্যানে করে এসে কয়লার আগুন দিয়ে বানাচ্ছে বীফ কিংবা ল্যাম্ব কাবাব। এদেশে রয়েছে প্রচুর গবাদিপশু। একজায়গায় চা বিরতিতে দেখি এরা চায়ের সাথে খেতে দিল ঝলসানো মাংস। এই তীব্র শীতের দেশে এসব খাবার শক্তির যোগান দেয় বটে।

মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র মঙ্গোলিয়া। এর উত্তরে রাশিয়া এবং তিন দিকে চীন। বাংলাদেশের চেয়ে ১৪ গুণ বড় দেশটিতে রয়েছে বাংলাদেশের চেয়ে ৫৪ গুণ কম জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার আবার ৪০% মানুষই বাস করে রাজধানী উলানবাটরে।

চেঙ্গিস খানের নাম দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম কোন মুসলিম নেতা। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। খান বা খাঁ একটি উপাধি যা বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়। উৎপত্তিগত ভাবে মঙ্গোলীয় ও তূর্কী ভাষায় এর অর্থ সেনানায়ক, নেতা বা শাসক। চেঙ্গিস খান প্রধান মঙ্গোলীয় রাজনৈতিক নেতা বা মহান খান। ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি। তিনি মঙ্গোল গোষ্ঠিগুলোকে একত্রিত করে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। নিকট ইতিহাসে এটিই ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য। তিনি মঙ্গোলিয়ার বোরজিগিন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এক সাধারণ গোত্রপতি থেকে নিজ নেতৃত্ব গুণে বিশাল সেনাবাহিনী তৈরী করেন। যদিও বিশ্বের কিছু অঞ্চলে চেঙ্গিস খান অতি নির্মম ও রক্তপিপাসু বিজেতা হিসেবে চিহ্নিত, তথাপি মঙ্গোলিয়ায় তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত ও সকলের ভালবাসার পাত্র। তাকে মঙ্গোল জাতির পিতা বলা হয়ে থাকে। তার প্রমাণ দেখতে পাই এয়ারপোর্ট থেকে বেড়িয়েই চেঙ্গিস খানের বিশাল মূর্তি।

বিলুপ্ত (?) গোলাপি-মাথা হাঁসের খোঁজে

মূল রচনাঃ সারাহ লাস্কো
রূপান্তর ঃ ফা-তু-জো খালেক মিলা

প্রায় এক শতাব্দী আগে, কলকাতার (ভারত) জলাভূমিগুলো ছিল উজ্জ্বল গোলাপী শিরের লাজুক এক হাঁসের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রজাতিটি গোলাপি-মাথা হাঁস (চরহশ-যবধফবফ উঁপশ) নামে পরিচিত। পুরুষ হাঁসটির ছিল রক্তিমাভ গোলাপী চঞ্চু, যার মাথা এবং গ্রীবার পালকগুলোও ছিল গোলাপী। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে আবার ঈষৎ গোলাপী অথবা পেপটো-বিসমল নামক রাসায়নিক উপাদানের মত উজ্জ্বল গোলাপী পালকও দেখা যেত। এই পাখিটি সচরাচর দেখা না গেলেও শিকারীদের দৃষ্টি এড়াত না। কারন সেসময় শিকার করাই ছিল এক অদ্ভুত খেলা। ১৯১০ সালে একটি গোলাপি-মাথা হাঁস স্টাফিং করে নিউইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি -তে রাখা হয়। তবে শেষ যে বুনো গোলাপী-মাথা হাঁসটি দেখা গিয়েছিল তাও দেখা গিয়েছিল এক শিকারী কুকুরের মুখে। তখন সময়টা ছিল ১৯৩৫ সালের জুন মাস, মৃত হাঁসটি কুকুরের মুখ থেকে পৌছায় চার্লস এম. ইনগ্লিস নামে জনৈক ব্যক্তির কাছে। যিনি দার্জিলিং জাদুঘর এর তৎকালীন কিউরেটর ছিলেন। গোলাপি-মাথা হাঁস বিশ্বে মহাবিপদাপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। যদিও গত কয়েক বছরে বেশ কিছু রির্পোট পাওয়া গেছে তবুও বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করেন, পাখিটি শুধু বিরল বা লাজুক নয়, বিলুপ্তও বটে। ২০০৯ সালে থেকে রিচার্ড থর্নস এই বিরল হাঁসটির খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রায় ৫০ টি হাঁসের একটি ঝাঁক এখনও মিয়ানমারে টিকে আছে।

২০০০-এর শুরুর দিকে দুইটি সংরক্ষণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান "বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল" এবং মিয়ানমার এর "বায়োডাইভার্সিটি এন্ড ন্যাচার কনজারভেশন এসোসিয়েশন (BANCA)" গোলাপি-মাথা হাঁসের খোঁজে নদী, লেক এবং জলাভূমিগুলোতে জরিপ শুরু করল। BANCA এর সাহায্যে থর্নস গাইড এবং ভ্রমণ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন যাতে তিনি তাঁদের সহায়তায় এই হাঁসটির সকল সম্ভাব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দূরবর্তী হটস্পটগুলোতে প্রবেশের অনুমতিপত্র ব্যবস্থা করতে পারেন। ২০১৬ সালের প্রায় সকল অভিযানের পর তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি তাঁর লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সেখানকার এক ক্যাফেতে বসে তিনি এবং তাঁর গাইড লে উইন স্থানীয় অধিবাসীদের পাখির বই দেখাছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসলেন এবং তিনি গোলাপি-মাথা হাঁসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে, "এটি অনেক বিরল পাখি।" থর্নস তাঁর গাইডের সাহায্যে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কখনো দেখছো?" লোকটি বলল যে, "সে এখানে নয়, অন্য জায়গায় দেখেছে। পাখিটি খুব বিরল এবং খুবই লাজুক প্রকৃতির। তুমি শুধু জলাভূমির কিছু অংশে একে খুঁজে পেতে পার।" এই ঘটনার প্রেক্ষিতে BANCA এর সাথে আলোচনার পর থনর্স এখন বিশ্বাস করেন যে, হাঁসটি হয়তো বর্ষা মৌসুমে অন্য কোথাও মাইগ্রেশনের আগে ঐ জলাভূমিতে আসে, হয়তো উপত্যকার কোথাও; যেখানে বছরের ঐ সময়ে কোন বহিরাগতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখন থনর্সের পরিকল্পনা এই যে, তিনি শরৎ-এর শুরুতে মিয়ানমার আসবেন এবং অক্টোবরের শুরুতে অনুসন্ধান শুরু করবেন। তাই তিনি অর্থ সহায়তা পাবার বিষয়ে "গ্লোবাল ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড"-এর সাথে আলোচনা করছেন। এবার থর্নস-এর ইচ্ছা একটি হাতি ভাড়া করার যার সাহায্যে তিনি হাঁস তাড়ানোর কাজ করবেন। যাতে গোলাপি-মাথা হাঁস খুঁজে পাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। থনর্স ও তাঁর সঙ্গীরা প্রকৃতিবিদ এবং লেখক ইরল ফুলার, আলোকচিত্রী জন হজেস এবং হজেস এর সঙ্গী পিলার ব্যুনো পরবর্তী অভিযানে যদি হাঁসটি দেখতে পান, তবে অবশ্যই এর সঠিক অবস্থান গোপন রাখবেন। প্রকৃতপক্ষে থর্নস যেখানে অনুসন্ধান চালাবেন সেই একই স্থানে ইতিমধ্যেই একজন ইউরোপীয়ান পাখি পর্যবেক্ষক হাঁসটিকে দেখেছেন।

পরিশেষে যদি থর্নস বিরল এই হাঁসটিকে সনাক্ত করে ছবি তুলে পুনরায় আবিষ্কার করতে পারেন; তবে শুরু হবে বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়- প্রকৃতি থেকে কিছুই হারিয়ে যাবার নয়। এই প্রেক্ষিতেই রিচার্ড থর্নসের আত্মবিশ্বাসী স্বীকারোক্তি- "যদি কেউ গোলাপি-মাথা হাঁস খুঁজে পায়, তবে সে আমিই হতে চাই।"

"সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" (সিটিসিইউ)ঃ একটি প্রস্তাবনা।

মোহাম্মদ মোক্তারুজ্জামান
ফরেস্ট রেঞ্জার
সভাপতি, বাংলাদেশ বন কর্ম নির্বাহী সমিতি

ভূমিকা

ঢাকা শহরে বা মেট্রোপলিটন সিটি সমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে তাল মিলিয়ে বৃক্ষ সংখ্যা বৃদ্ধির অবকাশ খুবই সীমিত। ছাদ বাগান বড় বৃক্ষের বিকল্প হয় না। কাজেই বিদ্যমান পুরাতন,বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষদের সংরক্ষণ, চিকিৎসা,পরিচর্যা এবং প্রয়োজনে না কেটে মেশিনের সাহায্যে উপড়ে নিয়ে রিলোকেট বা স্থানান্তর করা প্রয়োজন। প্রতি বছর ঝড়ে বৃক্ষ উপড়ে যাওয়ার ফলে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে বিপজ্জনক বৃক্ষের মুকুটের (ক্রাউন) ওজন কমানোর জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাটাই (প্রুনিং), প্রয়োজনে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। বন বিদ্যায় প্রতিনিয়তঃ নানা নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে। এর মধ্যে "ট্রি সার্জারী" অন্যতম। ফিলিপাইনস্থ "লস বানসে" অবস্থিত "ইউনিভার্সিটি অফ ফিলিপাইন" এর "কলেজ অফ ফরেষ্ট্রি এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস" থেকে এ বিষয়ে অনেকের মত হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ হয়।

ভারতের নিউ দিল্লি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঝড়ে ২০০৯ সনে ব্যাপক পুরাতন বৃক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ২০১০ সনে গাছপালার যত্ন নেয়ার জন্য "ট্রি অ্যাম্বুলেন্স" চালু করা হয়। পরবর্তীতে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে এবং সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে তা উদ্বোধন করা হয়। যদিও সেটি খুবই সীমিত আকারের একটি উদ্দ্যোগ। এ ধরণের জ্ঞান, ধারণা ও পর্যবেক্ষণগুলোকে পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে নিবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছে। (মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানোর জন্য এতে ইংরেজী শব্দসমূহ বাংলা অক্ষরে লিখা হয়েছে।)

কেন "সিটি ট্রি কেয়ার" ইউনিট ?

প্রতিটি জীবের বয়স হয়, রোগ হয়,জরাগ্রস্থ হয়। গাছ ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না, কথা বলতে পারে না। কৃষি ফসল বা ফল ফলাদির গাছের রোগ বালাই এর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ও উপদেশ নেট ঘাটলে পাওয়া যায়। এছাড়া কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এ কাজে নিয়োজিত। কিন্তু কোন বড় বৃক্ষের চিকিৎসা ও সার্জারী সম্পর্কে কোন তথ্য বা নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বন বিভাগেরও নিজস্ব বন ব্যতীত সিটি এলাকার বৃক্ষ নিয়ে (বোট্যানিক্যাল গার্ডেন ও বলধা গার্ডেন বতীত) কোন কাজ করার সুযোগ নেই। সিটি কর্পোরেশন সমূহের ও সে সক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। ঝড়ে গাছ ভেঙ্গে পড়লে, প্রাণহাণি হলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ কর্তৃপক্ষ আসেন এবং ডালপালা অপসারণ করেন। মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেন। কিন্তু এ অবস্থা নিরসন দরকার। প্রতি বছর বৃক্ষ সমূহ ভেঙ্গে জান মালের ক্ষয় ক্ষতি হতে দেয়া যায় না। বৃক্ষসমূহকে ভেঙ্গে পড়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

উনিশ শতকে ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ছিল আশি হাজার। আজ তা প্রায় ২ কোটি। ২ কোটি লোকের আবাসন ব্যবস্থা,পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উল্লম্ব নির্মাণের বা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু অক্সিজনের জন্য, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কার্বন মনোঅক্সাইড এর বিষ থেকে তথা বায়ু দূষণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সে হারে বড় বৃক্ষ রোপণ হচ্ছে না, সে সুযোগও বড় সীমিত। তবু সমাধান বের করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ, খালি জায়গা পেলে তাতে বড় ও বিরল জাতের বৃক্ষ লাগাতে হবে। তাদের পরিচর্যা করতে হবে। পুরাতন

বৃক্ষসমূহকে চিকিৎসা দিয়ে, সেবা শুশ্রুষা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে।

বনানী থেকে আবদুল্লাহপুর পর্যন্ত প্রধান সড়কের উভয় পাশে, বিমান বন্দর এলাকায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার অর্থায়নে বন বিভাগ নাগেশ্বর, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচুঁড়া, কদম সহ নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করেছিল। ঢাকা থেকে টঙ্গীর দিকে আসলে বনানী পৌঁছালে চোখ বন্ধ করেও বলা যেত বনানী এসে গেছে। কারণ বাতাসের প্রবাহ তথা অক্সিজেনের প্রবাহ বৃদ্ধি, তাপমাত্রার হ্রাস লক্ষণীয়ভাবে অনুভূত হতো। কিন্তু রাস্তা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কারণে অনেক গাছ কেটে ফেলতে হয়েছে ও হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকা শহরের অন্যান্য অংশেও অনেক গাছ কাটতে হয়েছে ও হচ্ছে। সেগুলির বয়স ১০ থেকে ৩০ বছর। হঠাৎ করে এখন পুনরায় রোপণের জন্য আমরা বিশ-ত্রিশ বছর বয়সী গাছ কোথায় পাব?

"সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" থাকলে গাছগুলিকে নিরাপদে অন্যত্র স্থানান্তর করা যেত কিংবা পরবর্তীতে নতুন কোন স্থানে রোপণের জন্য জীবিতভাবে মজুদ করে রাখা যেত।

"সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" এর রূপরেখা

"সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" মূলতঃ চালকসহ তিনটি গাড়ী, প্রশিক্ষিত একজন ট্রি সার্জন এর নেতৃত্বে দুই জন মেকানিক্যাল ইঞ্জনিয়ার, ৩ জন ফরেস্টার এবং ৭ জন প্রশিক্ষিত সহযোগি স্টাফ সমন্বয়ে গঠন করা যেতে পারে। এ তিনটি গাড়ীর একটি হবে বড় আকারের ট্রি স্পেড ভেহিকল। একটি হবে কমপক্ষে ৪০ ফুট উঁচুতে উঠতে পারে এমন ট্রি ট্রিমার ক্রেন। আরেকটিতে পাওয়ার "চেইন স", জেনারেটর, লং হ্যান্ডেল ট্রিমার, পানির ট্যাংক ও লম্বা পাইপ সহ ট্রি সার্জারীর যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র এবং টিমের সদস্যগণ থাকবেন।

৩। "সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" এর কার্য এলাকা।

সারা বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত করার প্রয়োজন ও অবকাশ আপাততঃ নেই। প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরে এর কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাব করা হলো। প্রয়োজন হলে চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ পরবর্তীতে তা চালু করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত "সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" এর যানবাহন ও যন্ত্রপাতির নমুনা চিত্র।

প্রস্তাবিত কার্যক্ষেত্র তথা ঢাকা শহরের বৃক্ষের বিবরণঃ

ঢাকা শহরের মাটিতে প্রকৃতপক্ষে কত রোপণকৃত বৃক্ষ আছে বা মোট আয়তনের কত পার্সেন্ট ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদিত আছে তার প্রকৃত হিসাব পাওয়া না। সিটি কর্পোরেশনেও সে হিসাব পাওয়া যায় না। বন বিভাগ ২০১৬-১৮ সনে হেনরী ম্যাথিউ-জহির ইকবাল এর নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশের বনের বহুমুখী জরীপের দূরূহ কাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু তাতে সিটিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রায় ২ কোটি জনসংখ্যার (১ কোটি ভাসমান বা মৌসুমী বাসিন্দা ধরলে) বাকী এক কোটি মানুষের জনপ্রতি একটি গাছ ধরলেও ১ কোটি গাছ থাকার কথা। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বলছে ঢাকায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমান ৭% অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার মতে ৬%। যাহোক, তবে এটি হতাশাব্যঞ্জক নয়। তবে এ সংখ্যা যেন কোনভাবেই আর না কমে বরং পূর্বাচল,ঝিলমিল, উত্তরা তৃতীয় প্রকল্প সহ বিভিন্ন সরকারী আবাসন প্রকল্পে ও বেসরকারী আবাসন প্রকল্পের রাস্তার পাশে, এভিনিউ ট্রি হিসাবে বিরল, দীর্ঘজীবি বৃক্ষ যেমন গর্জন, তেলসুর, চাম্পাফুল, নাগেশ্বর, বৈলাম, কামদেব, তাল,গাব, তমাল, আম, কদম ইত্যাদি বৃক্ষের বড় চারা বাধ্যতামূলকভাবে রোপণ ও সংরক্ষণ করতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে।

অনেকেই বলেন দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে বৃক্ষ কমেছে ঢাকায়। তবে পর্যবেক্ষণে তেমনটি মনে হয় নি। বরং ঢাকা শহরে রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা বেড়েছে এবং ক্রমশঃ বাড়ছে বলেই মনে হয়েছে। পুরাতন ঢাকার ইংলিশ রোড সংলগ্ন সবুজ বেষ্টনী, বঙ্গভবন ও এর সম্মুখভাগ, মহানগর নাট্যমঞ্চ, ওসমানী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। রমনা পার্ক, কাকরাইল, মিন্টো রোড। পান্থপথ শেষে পশ্চিমে শুরু ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ও লেক, লালমাটিয়া এলাকা। আগারগাঁও এলাকা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, সংসদ ভবন এলাকা, চন্দ্রিমা উদ্যান ও আশেপাশের এলাকা, বিজয় সরণীর পূর্ব প্রান্ত, বিমানবাহিনী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আবাসিক এলাকা হয়ে সেনানিবাস,মহাখালী ডি.ও.এইচ,এস, বনানী হয়ে এয়ারপোর্ট রোড, মিরপুর চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, বলধা গার্ডেন এলাকায় বৃক্ষের ব্যাপক সমারোহ বিদ্যমান। তবে রাজউকের বনানী ও গুলশান আবাসিক এলাকায় বৃক্ষরা বিরল। ডি.ও.এইচ.এস বারিধারার অবস্থাও ভালো নয়। উত্তরার প্রতিটি সেক্টরের পার্কে ও লেকের পাশে কিছু গাছ বিদ্যমান। বেসরকারী আবাসন সোসাইটি বসুন্ধরা এলাকায় পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ ও উপস্থিতি লক্ষণীয়। এছাড়াও গণপূর্ত বিভাগের আরবরিকালচার বিভাগ সচিবালয়, সরকারি অফিস, ওসমানী মিলনায়তন, হাইকোর্ট, ধানমন্ডি এলাকার ভিআইপি বিভিন্ন স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, মিন্টো রোড, ইস্কাটন ও সিদ্ধেশ্বরীর সরকারি বাড়ি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন সরকারি ভবনে বেশকিছু গাছ রোপণ করেছে।

বন বিভাগের হিসেবে মিরপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ৭৫ হাজার ও বলধা গার্ডেনে প্রায় ১৭ হাজার গাছ আছে। আরবরিকালচারের হিসেবে রমনা উদ্যানে পাঁচ হাজার ৫০টি ও সোহরাওয়ার্দীতে সাড়ে তিন হাজারের মতো গাছ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরিকালচারের হিসাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গাছ আছে প্রায় পাঁচ হাজার। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের হিসেবে তাদের ক্যাম্পাসে প্রায় তিন হাজার গাছ আছে। সিটি করপোরেশনের হিসেবে বঙ্গভবনে আট হাজার ৭শ ৮২, ধানমন্ডি লেক এলাকায় আছে চার হাজার ৮শ' ৭০টি গাছ। ওসমানী উদ্যানে গাছের কোনো হিসাব নেই সিটি করপোরেশনের কাছে। পাওয়া যায়নি গণভবন, চন্দ্রিমা উদ্যান ও সংসদ ভবন এলাকার গাছের সঠিক হিসাব। বিগত পাঁচ বছরে সামাজিক বন বিভাগ ঢাকার রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগিয়েছে ৪৮ হাজার ৬শটি। তবে সব মিলিয়ে ঢাকায় তিন লাখের বেশি বৃক্ষ নেই বলে ড. কাজী জাকের হোসেন ও আবু নাসের খান মনে করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন রয়েছে ৩১টি আর উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আওতায় রয়েছে ২৮ টি পার্ক। পার্কগুলিতে কিছু গাছ আছে। তবে সেখানে বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। শিল্পায়ন এর অনুষঙ্গ হলো নগরায়ণ। জিডিপি ও জি.এন.পি তে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য তা এড়ানোর কোন সুযোগ নেই। তবে সবকিছু যেন হয় পরিবেশ বান্ধব। কারণ যার জন্য এতসব করা সে মানুষদের তো সুস্থ আর জীবিত থাকতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাস আর বিশুদ্ধ পানি। সেজন্যই প্রয়োজন রোপিত বৃক্ষ সংরক্ষণ ও নতুন করে বৃক্ষ রোপণ।

ক্রিকেট বিশ্বকাপ উপলক্ষে ঢাকা শহরে সৌন্দর্য বর্ধন ও উন্নয়নের জন্য মিরপুর স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তা, প্রশিকা ভবন থেকে যে রাস্তা চিড়িয়াখানার দিকে চলে গেছে সেই হাজী রোডের দুই পাশের কয়েকশ' গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সড়ক সম্প্রসারণ সহ নানা উন্নয়ন কাজের জন্য বনানী-বিমানবন্দর-উত্তরা সড়কের পাশে রোপিত বড় বৃক্ষগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। যেগুলি বন বিভাগ ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ বিমান এর ও নিজস্ব অর্থায়নে রোপণ করেছিল।

এসব গাছগুলি প্রস্তাবিত "সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" থাকলে কাটতে হতো না। গাছ গুলো শিকড় বা মোথাসহ তুলে রিলোকেট বা অন্য জায়গায় লাগানো যেত বা ভবিষ্যতে লাগানোর জন্য মজুদ করা যেত। বিমান বন্দর

সড়কে এবারে দ্বিতীয় বারের মত বিউটিফিকেশন চলছে। ফুলের ও বনসাই এর গাছ লাগানো হয়েছে। সেখানে প্রতি ১০০ ফুট দূরত্বে একটি করে পুরাতন বৃক্ষ রাখা যেত। এখনো গর্জন, বৈলাম, চাম্পাফুল,কদম, তাল জাতীয় গাছ একশত ফুট দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে ও সমদূরত্বে লাগানো হলে সৌন্দর্যের কোন কমতি না হয়ে তা বাড়বে বলেই মনে হয়। সে বৃক্ষগুলি ভবিষ্যতে মাদার ট্রি হিসাবে বীজ ছড়াবে। শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সহ ছায়া প্রদান, ফুল প্রদান করবে। সবচেয়ে বড় কথা অক্সিজেন প্রদান করবে। ঢাকার রাস্তায় রোড ডিভাইডারের মাঝখানে গাছ দেখা যায়। তবে এর স্থায়ী বেশীদিন হয় না। দেখা যায় সেসব গাছের মূল বেশী নীচে যায় না। কারণ ডিভাইডারের মাঝখানে অল্প মাটি ভরাট করে গাছ রোপণ করা হয়।

কখনো মারা যায় আবার কখনো রুগ্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে দুই চারটি গাছ বেঁচে থেকে অসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। এখানেও পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে ফলজ, বনজ গাছ রোপন করা যেতে পারে। ঢাকায় শতবর্ষী বৃক্ষের সংখ্যা ১০০০ এর বেশী হবে না। রমনা,হেয়ার রোড,ফুলার রোড,বেইলী রোড, বাংলা একাডেমী, চামেলী হাউজ বিজ্ঞান কলেজ, বলধা গার্ডেন ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে এগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আমাদের আত্মার আত্মীয়। তবে ২৫-৩০ বছর বয়সের বেশী যুবক বৃক্ষের সংখ্যা কম নয়।

ঢাকার ১৫০ বছর আগের ছবি

ঢাকার বর্তমান চিত্র

৫। প্রস্তাবিত "সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট" যে কাজগুলো করবে তা সংক্ষেপে নীচে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) ঢাকা শহরের ১০ বছর বয়সের বেশী সকল গাছ গণনা করবে ও জাত ওয়ারী মাপসহ তালিকাভুক্ত করবে। গাছের ক্রমিক নং সহ তথ্যাদি, স্বাস্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে।

খ) প্রতিটি গাছে নাম্বারিং ট্যাগ দেবে।

গ) প্রতিটি গাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করবে। বয়স্ক বা ফিজিক্যাল রোটেশন অতিক্রান্ত গাছ সমূহকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনবে।

ঘ) যে সমস্ত বয়স্ক গাছের গুঁড়িতে "ঢোর" বা "হলো" হয়েছে সেগুলির ময়লা পরিস্কার করে তা সার্জারী করে সিমেন্ট দিয়ে বা প্রযোজ্য কেমিক্যাল দিয়ে বন্ধ করে দিবে। বর্তমানে সিমেন্টের পরিবর্তে থার্মোকোল ও এক ধরণের ফোম পাওয়া যায়। প্রয়োজনে এম.এস রড ব্যবহার করতে হবে। ক্রাউন বা মুকুট ভারী হয়ে গেলে যাতে গাছ উপড়ে না পড়ে সেজন্য প্রুনিং করে দেবে এবং কর্তিত স্থানে যাতে সংক্রমণ না হয় সেজন্য প্রযোজ্য প্রলেপ দেবে।

ঙ) দেয়ালের উপর হেলে পড়া, রাস্তার পাশে হেলে পড়া, বাড়ী ঘরে হেলে পড়া বিপজ্জনক গাছ লপিং করে খাটো করে দেবে। তবে তা সাবধানতার সাথে "চেইন স" দিয়ে দ্রুততার সাথে কাটতে হবে। শহরের সব জায়গায় বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকে। বৈদ্যুতিক হ্যান্ড "স" ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে গাছের কোষ ও কলা ফেটে না যায়। তারপর কর্তিত উন্মুক্ত অংশ যাতে বৃষ্টিতে ভিজে পঁচে ফাঙ্গাস না ধরে, পিঁপড়া বা পতঙ্গ বাসা না বাঁধে সেজন্য মোম বা আলকাতরা বা পেইন্ট এর আস্তরণ দিতে হবে। গাছটিকে শক্ত সাপোর্ট দেবে।

চ) সরকারী জরুরী প্রয়োজনে বা ব্যক্তি মালিকানাধীন গাছ জরুরী প্রয়োজনে কিংবা উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে অপসারণ প্রয়োজন হলে সেগুলি না কেটে ট্রি স্পেড ও ম্যানুয়ালী গোড়াসহ তুলে রিলোকেট বা নুতন জায়গায় স্থানান্তর করবে বা ভবিষ্যতে রোপণের জন্য মজুদ করবে।

ছ) কোন ল্যান্ড স্কেপিং এর জন্য কোন বিশেষ জাতের গাছ সারিবদ্ধ রোপণের ক্ষেত্রে তা রোপণে সহায়তা করা ও মাঝখানের অবাঞ্ছিত গাছ তুলে অন্যত্র সরিয়ে নেবে বা মজুদ করবে।

জ) বোটানিক্যাল গার্ডেন বা পার্ক সমূহে কিংবা নুতন কোন রক্ষিত এলাকায় কোন নুতন সেকশন করতে হলে ছোট চারা লাগাতে হয়। ফলে সেগুলি টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়। সে ক্ষেত্রে যেখানে ১০-১৫ বছর বয়সী চারা কোন স্থানে বা বনে পাওয়া গেলে তা সংগ্রহ করে এনে তা লাগাতে পারবে।

ঝ) বোটানিক্যাল গার্ডেন বা পার্ক সমূহে বা রাস্তার পাশের গাছ ঘন হলে কেটে থিনিং না করে সুস্থ্য সবল গাছগুলি তুলে রিলোকেট করবে বা পরে অন্য কোথাও রোপণের জন্য মজুদ করবে।

ঞ) বায়ু দূষণ ও ধুলাবালি সালোক সংশ্লেষণের প্রধান অন্তরায়। ফলে বৃষ্টি নিয়মিত না হলে বা শুস্ক মৌসুমে বড় গাছের পাতাগুলো নিয়মিত ধুয়ে দিতে হবে।

ট) পাতার নমুনা নিয়ে গাছের খাদ্যে মিনারেল এর ঘাটতি নিরূপণ করতে হবে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঠ) তারপরও কাল বৈশাখীর তান্ডবে গাছ উপড়ে পড়ার সংবাদ পেলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং পুলিশকে সংবাদ দিয়ে সেখানে ইউনিটটি দ্রুত পৌঁছাবে। মানুষ ও জীবজন্তু উদ্ধার করবে। দ্রুততার সাথে গাছের ডালপালা অপসারণ করবে। সম্ভব হলে গাছটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

ড) গাছে পেরেক মারা, ব্যানার, হোর্ডিং ঝুলানো বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি প্রতিরোধ করবে।

ঢ) অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।

বড় গাছ স্থানান্তর প্রক্রিয়া (ট্রি রিলোকেশন)

যখন কোন অট্টালিকা বা সড়ক নির্মাণ তথা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের স্থানে মূল্যবান, বিরল, যুবক বৃক্ষ থাকে সেগুলিকে নুতন স্থানে রোপণের জন্য ট্রি স্পেড ব্যবহার করতে হবে। গাছটির শিকড় কতটুকু মাটির নীচে প্রোথিত হয়েছে গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করে গাছের ব্যস যত ইঞ্চি হবে তাকে ছয় দিয়ে গুণ করে সেই মাপের ব্যাসের সার্কেল করে এবং মাটি ও গাছের বয়স বিবেচনায় ১ ফুট থেকে ৪ ফুট গভীর মাটির নীচ থেকে গর্ত করে কেটে সাবধানতার সাথে তুলতে হবে। তবে বড় পাম জাতীয় বৃক্ষের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৬ ফুট গভীরেও যেতে হতে পারে। প্রতিদিন অল্প অল্প করে দূরবর্তী শিকড় গুলো কেটে দিয়ে মাটি অল্প অল্প সরিয়ে অপেক্ষা করতে হবে যাতে গাছটির সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় গাছে পানি সেচ দেয়া উচিত। ১৫ দিন পর ট্রি স্পেড দিয়ে অথবা বড় গাছের ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক দিয়ে গোড়া সহ তুলে গোড়ায় বস্তা পেঁচিয়ে ভালোভাবে বেঁধে সাবধানতার সাথে

ক্রেনের সাহায্যে বা স্পেড ট্রাকের সাহায্যে পরিবহণ করে নিয়ে একটি যথেষ্ট উঁচু শেডের ভেতরে রাখতে হবে। পরিবহনের সময় সরু রাস্তা পরিহার করতে হবে। শেডে সোজা করে, প্রয়োজনে খুঁটি দিয়ে রাখতে হবে। পানি সেচ দিতে হবে, বেশীরভাগ পাতা ছাঁটাই করে দিতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ডালপালা প্রুনিং (ছাটাই) করে দিতে হবে। শেডে ১ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত রেখে পুনঃরোপণ করলে উত্তম। তারপর গাছটি সুস্থ হলে, পাতা ও শিকড় ছাড়লে নব নির্বাচিত জায়গায় পরিকল্পিতভাবে তা রোপণ করতে হবে।

উপড়ানোর সাথে সাথে রোপণের জন্য সমমাপের চেয়ে এক ফুট বেশী ব্যস ও গভীরতার গর্ত আগে থেকে করে রাখতে হবে। সেখানে শুধুমাত্র পঁচা গোবর সার ও কালো মাটি বা টপ সয়েল দিয়ে সে গর্তে নিয়ে লাগাতে হবে। মাটি শক্ত করে পুঁতে দিতে হবে। শক্ত বাঁশের দুইটি বা তিনটি খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। তার আগে বেশীরভাগ পাতা ছাঁটাই করে নিতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ডালপালা প্রুনিং (ছাঁটাই) করে দিতে হবে। যেহেতু সার্জারীর রোগী তাই জল সেচ দিতে হবে। ১৫ দিন চাটাই বা পলিথিন দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন পাতা গজালে আস্তে আস্তে শেড বা ছায়া সরিয়ে ফেলতে হবে। এসব কাজের ব্যয়ভার গাছ ও অবস্থান বুঝে বিভিন্ন রকম হতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট রেটে তা আবদ্ধ করা যাবে না। গাছের পরিচর্যা, চিকিৎসা, সার্জারী, উপড়ানো ও নতুন স্থানে লাগানোর খরচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

সংগঠন

ক) বন বিভাগের বিদ্যমান "স ডক্টরিং ইউনিট" এর জনবল এর সাথে অন্যান্য জনবল যোগ করে একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করা যেতে পারে। জনবল সমূহকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এ ইউনিটটির অবস্থানস্থল হবে ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন। পরিচালক, বোটানিক্যাল গার্ডেন এর তত্বাবধানে ও নির্দেশনায় ইউনিটটি কাজ করবে। ব্যয় সংকুলানের জন্য জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

অথবা

খ) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কে এ রকম একটি করে ইউনিট গঠন করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা যেতে পারে।

অথবা

গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আওতায় এ রকম ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা

পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বন বিভাগ কর্তৃক ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে বিরল, বিলুপ্তপ্রায় ও সৌন্দর্যবর্ধনকারী দেশীয় বৃক্ষের ৫ বছর, ৭ বছর, ১০ বছর ও ১৫ বছর বয়সী চারাবৃক্ষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করার জন্য ও এটি বন ব্যবস্থাপনায় ও বন বিদ্যায় সংযোজন করার প্রস্তাব করা গেল। যাতে নব নির্মিত সড়ক, সরকারী প্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকা, রক্ষিত এলাকা,পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে তা নির্দিষ্ট দূরত্বে নান্দনিকভাবে লাগানো যায়।

উপসংহার

বন বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কিংবা হর্টিকালচার বিভাগ, যে বিভাগের অধীনেই হোক না কেন প্রস্তাবিত "সিটি ট্রি কেয়ার ইউনিট"টি ঢাকা শহরের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবিত নামের পাশাপাশি "এমার্জেন্সি ট্রি কেয়ার ইউনিট, "ট্রি সার্জারী ইউনিট", "মোবাইল ট্রি কেয়ার ইউনিট", "মোবাইল ট্রি রেসকিউ ইউনিট", "ভ্রাম্যমাণ বৃক্ষ পরিচর্যা ইউনিট" নাম সমূহও প্রস্তাব করা হলো। বিদেশে চাটার্ড ফরেস্টার/ট্রি সার্জনদের ব্যক্তিগত ফার্ম আছে। বাংলাদেশে নেই। সরকারী পর্যায়ের পাশাপাশি এই ধরণের ইউনিট বেসরকারী পর্যায়ে গঠনের বিষয়টি উৎসাহিত করতে হবে। বন বিভাগ ও হর্টিকালচার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এগিয়ে আসতে পারেন। তজ্জন্য জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের প্রণোদনার প্রয়োজন।

তথ্য সূত্রঃ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার রিপোর্ট,ইন্টারনেট এবং প্রফেসর ড: আরমান্ডো পালিজন।

Green Climate Funds (GCF): An Overview

Imran Ahmed[1] and Rafiqa Sultana[2]

About the GCF

The Green Climate Fund (GCF) is a new global fund created to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF helps developing countries limit or reduce their greenhouse gas (GHG) emissions and adapt to climate change. It seeks to promote a paradigm shift to low-emission and climate-resilient development, taking into account the needs of nations that are particularly vulnerable to climate change impacts.

It was set up by the 194 countries who are parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010, as part of the Convention's financial mechanism. Formally established by a UNFCCC decision in Durban, South Africa in December 2011. It aims to make an ambitious contribution to attaining the mitigation and adaptation goals of the international community. Over time it is expected to become the main multilateral financing mechanism to support climate action in developing countries.

Green Climate Fund (GCF) has a goal of mobilizing jointly USD100 billion address the needs of developing countries. Fund is available for four categories Project Size i.e; Micro (cost is upto 10 million USD), Small (cost is 10-50 million USD), Medium (cost is 50-250 million USD) and Large (cost is more than 250 million USD).

The board of the GCF met for the first time in August 2012. GCF is overseen by a 24 membered Board, composed of equal number of members from developing and developed countries. GCF Headquarter is in Songdo (Incheon), South Korea. World Bank serves as the interim trustee. GCF launched its initial resource mobilization in 2014, and rapidly gathered pledges worth USD 10.3 billion. These funds come mainly from developed countries, but also from some developing countries, regions, and one city (Paris).

GCF's activities are aligned with the priorities of developing countries through the principle of country ownership, and the Fund has established a direct access modality so that national and sub-national organizations can receive funding directly, rather than only via international intermediaries.

The Fund pays particular attention to the needs of societies that are highly vulnerable to the effects of climate change, in particular Least Developed

[1] Assistant Chief Conservator of Forests, Development Planning Unit, Bangladesh Forest Department
[2] Assistant Conservator of Forests, Development Planning Unit, Bangladesh Forest Department

Countries (LDCs), Small Island Developing States (SIDS), and African States. The Fund's investments can be in the form of grants, loans, equity or guarantees. The GCF will support projects, programmes, policies and other activities in all developing country parties to the UNFCCC.

The GCF finances activities to both enable and support adaptation, mitigation (including REDD+), technology development and transfer, capacity-building and the preparation of national reports.

Conditions and Eligibility Requirements

The GCF is an operating entity of the UNFCCC's financial mechanism. Recipient countries can submit funding proposal through National Designated Authorities (NDAs). Recipient countries will be allowed direct access through accredited sub-national, national and regional implementing entities they propose and set up as long as these implementing entities fulfil certain fiduciary standards. GCF funds can also be accessed through multilateral implementing entities, such as accredited multilateral development banks and UN agencies.

Accessing the Fund

All developing country Parties to the Convention are eligible to receive resources from the GCF.

Key steps for countries to engage with/access to GCF

1. Establish and maintain a National Designated Authority(NDA) or focal point: Economic Relations Division (ERD), Finance Ministry has been selected as NDA in November 2014. United Nations wing in ERD works as NDA Secretariat. NDA secretariat is located at the ERD, Planning Commission, Dhaka. Roles of NDA are:

- ✓ Strategic oversight;
- ✓ Country coordination-convening stakeholders;
- ✓ Starting Point : No Objection to Funding Proposals ;
- ✓ Forward Point : Fund Release, implementatio. Monitoring;
- ✓ Nominating for applying for NIEs; and
- ✓ Leading the readiness & engagement

2. Strategic engagement through country programmes: The Country Programme (CP) of Bangladesh to the Green Climate Fund (GCF) has prepared to provide a consolidated overview of the received GCF support and aspired climate change focused projects/ programmes reflecting the country's climate change resilience building and emission reduction strategies and priorities. Finally, total 48 projects/program have been identified for CP into two project preparatory pipeline as projects/program pipeline A and projects/program

pipeline B. Out of 48 projects/programs, 28 have been selected for pipeline A and 20 have been selected for pipeline B.

The proposed 48 projects and programs in this country programme were identified in an inclusive multiphase analysis, revision, consultative and prioritisation process. All participants selected from the public, private and CSO partners were given the opportunity to submit project idea/concept note (based on a simplified template of the GCF concept notes for consideration in the project/programme pipeline through a competitive selection process. The NDA received 230 submissions of concept notes.

The preparatory pipeline A contains projects of strategic importance and was selected in perspective to ensuring that the projects/programs in the project preparatory pipeline A of the CP. The concept notes in the project preparatory pipeline B are not being perceived as being of lower importance, but some were overlapping with other efforts proposed in the project preparatory pipeline A. Some concept notes and project ideas can also be further elaborated and developed until the revision of the CP in 2018.

3.Identify and seek accreditation of entities to access resources from the Fund: GCF invests in adaptation and mitigation activities in developing countries, managing a project portfolio that is implemented by its partner organizations, known as Accredited Entities. There are two types of Accredited Entities which are National Implementing Entity (NIE) for direct access and Multilateral Implementing Entity (MIE) for indirect access. Two NIE and sixteen MIE have been selected for the country to coordinate between Executive Entity (EE) and GCF authority for accessing fund from the GCF. Roles of Executing/Implementing entities are;

- ✓ Develop and submit funding proposal;
- ✓ Execute funding proposal; and
- ✓ Reporting to NIE >NDA+GCF.

Two NIEs are IDCOL and PKSF and sixteen MIEs are ADB, AFD, EIB, FAO, GIZ, HSBC, IFAD, IFC, IUCN, JICA, KfW, UNDP, UNEP,WFP, WMO and World Bank. Roles of accredited entities are;

- ✓ Develop & submit funding proposals;
- ✓ Oversee project management, implementation & reporting to NDA+GCF;
- ✓ Deploy & administer financial instruments; and
- ✓ Mobilize private & public sector capital (include Co financing).

Develop projects and programmes to bring forward funding proposals through accredited entities: Till to date three funding proposal have been approved by the GCF Board and four draft proposals have been submitted to GCF for Board consideration in future from Bangladesh by the NDA through different accredited entities. Approved proposal list are given below:

Approved Funding Proposal of Bangladesh				
GCF Identification No.	**Project/Program Title**	**Accredited Entity**	**Executing Entity**	**Project Size (Total Cost)**
FP004	Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM)	KfW	LGED	USD 80.00 million
FP069	Enhancing adaptive capacities of coastal communities, especially women, to cope with climate change induced salinity	UNDP	Ministry of Women and Children Affairs (MoWCA)	USD 32.90 million
FP070	Global Clean Cooking Program-Bangladesh	World Bank	Department of Finance Implementing Partner: IDCOL	USD 82.00 million

Involvement of Bangladesh Forest Department to access GCF

Bangladesh Forest Department (as Executive/Implementing Entity) has submitted a project concept note titled "Climate Resilient Coastal Forestry in Bangladesh" to ERD through Ministry of Environment, Forest and Climate Change in February 2018. This project has been signified as a Pipeline A1 in the Bangladesh's Country Program for the Green Climate Fund. This indicates that the project has been recognized by the NDA to have the highest degree potential to contribute in the country's action plan for combating Climate Change. IDCOL is the NIE of this project. IDCOL formally submitted the concept note with Project Preparation Facilities (PPF) application to GCF through NDA in June 2018. Total cost of the project is 80 million USD. The concept note has been approved by the GCF authority in December 2018 and is also providing a grant amounting USD 0.329 million in order to prepare the funding proposal. Once the funding proposal is developed it will be submitted to GCF Board by 2020. This project will help the gov. of Bangladesh to restore the coastal region and will make the country more resilient to climate change impact.

GCF at a Glance

2009: The general concept for GCF is first proposed at the Conference of the Parties (COP) to the UNFCCC in Copenhagen, Denmark (COP 15).

2010: The COP in Cancun, Mexico (COP 16), decides to establish GCF.

2011: GCF's Governing Instrument is adopted in Durban, South Africa (COP 17)

2012: GCF's governing Board holds its first meetings.

2013: GCF's first Executive Director Héla Cheikhrouhou is appointed. The Fund establishes its permanent headquarters in Songdo, Republic of Korea, in December 2013.

2014: Following the establishment of its operational principles and guidelines, GCF commences its initial resource mobilization, raising over USD 10 billion equivalent by the end of the year.

2015: The first investment decisions are taken, including both mitigation and adaptation projects, meeting the target set by the UNFCCC in advance of the Paris COP.

2016: Marks GCF's first full year of operations, with the Fund developing a project portfolio of 35 projects, worth over USD 1.5 billion by the end of the year, to be implemented by its 48 Accredited Entities.

2017: The Fund made great strides in accelerating climate action on the ground, with 19 projects under implementation by the end of the year, totaling USD 633 million in GCF resources.

2018: Bangladesh Forest Department's concept note titled "Climate Resilient Coastal Forestry in Bangladesh" has been approved by the GCF authority.

Source: GCF Website, NDA website, Country Program of ERD

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০১৮ "ক-গ্রুপ"

১ম স্থান: খাদিজা সামীহা ইকবাল, বেকভিউ সাউদ

২য় স্থান: হাসান ফারিয়া হক, মাস্টার মাইন্ড

৩য় স্থান: ইফরান আহমেদ, সেন্ট ফলস স্কুল

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০১৮ "খ-গ্রুপ"

১ম স্থান: তাহাম্মুল তানজিম, আদমজী ক্যান্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

২য় স্থান: মারিয়া ইসলাম অবন্তী, ভিকারুন নিসা স্কুল এন্ড কলেজ

৩য় স্থান: আদৃতা আমির (রোদসী), ভিকারুন নিসা স্কুল এন্ড কলেজ

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০১৮ "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গ্রুপ"

১ম স্থান: রাশেদুল হাসান (আবীর), বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যা, সিরাজগঞ্জ

২য় স্থান: মোঃ আবিদ হোসেন, মহাখালী মডেল হাই স্কুল

৩য় স্থান: মাসুদুল ঈমান রিজভী (মারজুক), সোয়াক স্কুল ফর অটিজম